দ্বিতীয় অধ্যায়

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের মুখপত্রে প্রকাশিত সাহিত্যের বিষয়বস্তুগত বিশ্লেষণ

হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের মুখপত্রে প্রকাশিত সাহিত্যের বিষয়বস্তুগত বিশ্লেষণ

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে হাংরি, শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের শৈলী আলোচনার আগে এই সাহিত্যধারা তিনটির 'বিষয়' (Content) সম্পর্কে বুঝে নেওয়া দরকার। তাই এই অধ্যায়ে উক্ত সাহিত্য-আন্দোলনত্রয়ের মুখপত্রে প্রকাশিত সাহিত্যের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হল। তবে এই সাহিত্য-আন্দোলনকারীরা যে সবসময় খুব নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তা কিন্তু নয়। হয়তো ঠিক বিষয় (Subject) নেই কোথাও কোথাও, আছে কেবল 'থিম' (Theme)। 'Dictionary of Literary Terms and Literary Theory'-তে 'Subject' ও 'Theme'-এর মধ্যে পার্থক্য করে বলা হয়েছে, "Properly speaking, the theme of a work is not its subject but rather its central idea, which may be stated directly or indirectly. For example, the theme of *Othello* is jealousy." (Cuddon, p.721) আবার 'A Glossary of Literary Terms'-এ বলা হয়েছে "Theme is sometimes used interchangeably with 'motif', but the term is more usefully applied to a general concept or doctrine, whether implicit or asserted, which an imaginative work is designed to involve and make persuasive to the reader." (Abrams & Harpham, p.230) সুতরাং, উক্ত ত্রিবিধ আন্দোলনের বিষয়গত উপাদান ও উপকরণগুলিকে (Content elements and components) বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তারে আলোচনা করার মাধ্যমে আন্দোলনত্রয়ের বিষয়গত অভিমুখটিকে (Content Orientation) বা 'থিম'টিকে চিহ্নিত করাই বর্তমান অধ্যায়ের অন্বিষ্ট। সমগ্র আলোচনাটিকে আন্দোলনভেদে তিনটি পৃথক উপ-অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হল।

১। হাংরি

যৌনতা কিংবা আত্মজিজ্ঞাসা

হাংরিদের জন্মকাল থেকেই বলা হয়ে আসছে যে তাঁদের লেখালেখির বিষয় হল যৌনতা তথা অশ্লীলতা। প্রথমত, অশ্লীলতা কখনও বিষয় হতে পারে না; তবে কোনো বিষয়ের মধ্যে 'অশ্লীলতা' – এই বিশেষ গুণ বা দোষ যা'ই বলা হোক না কেন, তা থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। যাঁরা হাংরিদের লেখালেখির বিষয় হিসেবে যৌনতাকে বুঝেছেন বা বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন 'প্রতিষ্ঠানে'র ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত বা বলা যায় প্রতিষ্ঠানের মদতপুষ্ট খ্যাতনামা লেখক-আলোচক-সমালোচক-বুদ্ধিজীবী (হাংরিদের ভাষায় এস্টাব্লিশমেন্টের চাকর), এছাড়া আরও এক শ্রেণির সমালোচক যারা হাংরি লেখা ভালো করে না পড়েই হাংরি লেখার সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। মলয় রায়চৌধুরী ইংরেজিতে প্রথম যে বুলেটিনটি প্রকাশ করেছিলেন ১৯৬১ সালে (ইংরেজিতে প্রকাশের কারণ হল মলয় রায়চৌধুরী তখন পাটনায় থাকতেন, এবং সেখানে কোনো বাংলা প্রেস ছিল না), তা থেকে খুব স্পষ্টভাবে জানা যায় যে হাংরিদের লেখালেখির বিষয় ছিল "The merciless exposure of the self in its entirety."[১] অর্থাৎ সামগ্রিক আত্মোন্মোচন। তাই নিজের মূল খোঁজার প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসতে দেখা যায় তাঁদের লেখায়। তাঁরা মনে করতেন, আমাদের জন্মগ্রহণ ব্যর্থ হয়ে যায় যদি আমরা আমাদের অস্তিত্বের আসল অর্থটাই না জানি, যদি জানতে না পারি আমি কে এবং এই বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু কণা, প্রতিটি প্রাণের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারি। সুবো আচার্য 'স্বাধীন ও যথেচ্ছ রচনাসমূহ'তে বলেছিলেন -

> কতোদিন বেঁচে আছি অথচ আজও জানি না কেন বেঁচে আছি –
> কী চাই আমি তা জানি না। (ক্ষু.স. পৃ.৪৯)

তাই তাঁরা বারবার বুঝতে চেয়েছেন নিজেকে, নিজের সঙ্গে এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকণার সম্পর্ককে। 'merciless' বিশেষণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে শৈলেশ্বর ঘোষ 'আমার পেছনে কে?' কবিতায় বলেছিলেন "আত্মার জন্য কোনো আইন মানি না আমি" (ক্ষু.স. পৃ.৮৯)। নিজের অস্তিত্বের মূলকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা পৌঁছে গিয়েছিলেন একদম আদিতে - শুক্রে, ডিম্বাণুতে, এবং আমাদের জন্ম-প্রক্রিয়ায়। মূলে পৌঁছতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁরা বলতে পেরেছিলেন -

এত মানুষ, এত শুক্র; আমি পড়েছি, শুক্রকীট। শুক্রকীটই সব, দলদল শুক্র। আমার ষোলো বছরের শুক্রটি আমি, আমার বাবার দেওয়া শুক্রকীট।

(আপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শুকিয়ে যায় কেন', ক্ষু.স. পৃ.৭৯)

এই ধরণের ভাবনাচিন্তাকে কেউ নিছক 'যৌনতা' বা 'অশ্লীলতা'র তকমা দিয়ে দেগে দিতেই পারেন; সেক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের জন্মটাই অশ্লীল হয়ে পড়ে। এবং এই বিচার একান্তভাবেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে, যে কারণে ফাল্গুনী রায় 'আমার বাইবেল আমার রাইফেল' কবিতায় বলছেন –

শ্রীমদ্ভাগবৎ পড়ে কেউ পূণ্য সঞ্চয় করে – কেউ ভাইবোনের
যৌন সঙ্গমের সংবাদ পায় ওই ধর্মগ্রন্থ পড়ে – (ক্ষু.স. পৃ.২২১)

'আত্ম'-এর জিজ্ঞাসা, সংকট, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, উপলব্ধি সবকিছুকেই তাঁরা তুলে ধরেছেন কোনো আড়াল না রেখে, প্রথম বুলেটিনে মলয় রায়চৌধুরী একেই বলেছিলেন 'merciless exposure of the self'।

আলোচনায় প্রবেশ করা যাক হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরীর লেখার সূত্র ধরে; হাংরি আন্দোলনে যাঁর ভূমিকাকে তুলনা করা হয়ে থাকে সিম্বলিসমে স্টিফেন মালার্মে, ইমেজিসমে এজরা পাউন্ড, পরাবাস্তববাদে আঁদ্রে ব্রেতঁ এবং বিট আন্দোলনে অ্যালেন গিন্সবার্গের ভূমিকার সঙ্গে।[২] তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শয়তানের মুখ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৫ তে প্রকাশিত হয় 'জখম'। আর এই দু'য়ের মাঝেই তিনি লিখেছিলেন সেই কিংবদন্তি-প্রায় কবিতা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'; যে কবিতাটি লেখার অপরাধে 'অশ্লীলতা'র দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল একসময়, কারাবাস করতে হয়েছিল তাঁকে। বড়ো বেশি শরীরধর্মী, যৌনতার আঁশটে ভাষায় লেখা এই কবিতা পড়ে আপাত-শ্লীল সমাজ অস্বস্তি বোধ করেছিল সেদিন; অথচ কবিতার ভিতরে যে চরম যন্ত্রণার প্রকাশ তা বুঝতে পারেননি বা বুঝতে চাননি তাঁরা কেউ। কবিতাটিতে কবির অপরিসীম যন্ত্রণা খুব স্পষ্ট, খানিকটা উদ্ধৃত করা হল -

ওঃ মরে যাবো মরে যাবো
আমার চামড়ার লহমা জ্বলে যাচ্ছে অকাট্য তুরুপে
আমি কি কর্বো কোথায় যাবো ও কিছুই ভাল্লাগছে না
সাহিত্য-ফাহিত্য লাথি মেরে চলে যাবো শুভা
...
প্রতিটি শিরা অশ্রুস্রোত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে হৃদয়াভিগর্ভে

শাশ্বত অসুস্থতায় পচে যাচ্ছে মগজের সংক্রামক স্ফুলিঙ্গ
মা, তুমি আমায় কঙ্কালরূপে ভূমিষ্ঠ করলে না কেন?
তাহলে আমি দুকোটি আলোকবর্ষ ঈশ্বরের পোঁদে চুমু খেতুম
কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না আমার কিছুই ভালো লাগছে না।[৩]

আপাত অশ্লীল এই ভাষ্যকে মন্থন করে সচেতন পাঠক পেয়ে যেতে পারেন অমৃত; আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জরিত এক অস্থির আত্মার ক্রন্দনধ্বনি ও ছটফটানি। কবি অস্থিরভাবে লিখে গিয়েছেন -

আমি আমার নিজের মৃত্যু দেখে যেতে চাই
মলয় রায়চৌধুরীর প্রয়োজন পৃথিবীর ছিল না
তোমার তীব্র রূপালি য়ুটেরাসে ঘুমোতে দাও কিছুকাল শুভা
শান্তি দাও, শুভা শান্তি দাও
...
আমার বাবা মা অন্য হলেও কি আমি এরকম হতুম?
সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শুক্র থেকে মলয় ওর্ফে আমি হতে পার্তুম?[৪]

এই পৃথিবীতে নিজের কোনো প্রয়োজন আদৌ ছিল কিনা - এই জিজ্ঞাসা থেকে এক অস্থির আত্মা এই জিজ্ঞাসায় গিয়ে উপনীত হয় যে, তাঁর এই অস্তিত্বের সম্ভাবনাই বা কতটুকু ছিল; ভিন্ন কোনো শুক্র থেকেও সে'ই হতো কিনা। হাংরিরা বুঝে ফেলেছিলেন যে মানুষের জন্ম আসলে 'সম্ভাবনা তত্ত্বের' (Probability Theory) অনন্ত বিন্যাস ও সমাবেশের (Permutations & Combinations) হিসাবের মতো। গতানুগতিক কবিতা পাঠে অভ্যস্ত আমাদের মন ১৯৬৪-তে প্রকাশিত এই কবিতাটির প্রাথমিক পাঠে অস্বস্তিতে পড়ে ঠিকই; কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে পারলে এবং একটু সচেতন হলেই বোঝা যায় যে, কবিতাটি অন্য এক ধরনের মর্মপীড়ায় আক্রান্ত করে আমাদেরকে। 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' গ্রন্থে উত্তম দাস এই কবিতাটি প্রসঙ্গে বলেছেন -

> প্রথম পাঠেই মনে হবে আমাদের সংস্কারের বাইরে এ কবিতা। কিন্তু গেঁথে যাবে একটা আর্তচিৎকার – অসহায়।[৫]

আসলে হাংরিদের কাছে কবিতা হল তাঁদের অস্তিত্বের সম্প্রসারণ; এবং এই ব্যাপারে তাঁরা সচেতনভাবেই আগাগোড়া 'merciless'। শ্রীমন্তী সেন 'হাংরি আন্দোলনের কবি মলয় রায়চৌধুরী' শীর্ষক প্রবন্ধে এজন্যই 'চরমপন্থী-শিল্পী'[৬] শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন, যার

মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন সেই সব শিল্পীদের যাঁরা তাঁদের শিল্পকর্মের প্রতি চূড়ান্তভাবে সমর্পিত।

শ্লীলতা বা অশ্লীলতার ধারণা মাথায় রেখে হাংরিরা কোনোদিনই লেখালেখি করেননি; 'ক্ষুধার্ত' প্রথম সংকলনের সম্পাদকীয়তেও বলা হয়েছিল সে কথা, "আমাদের শ্লীলতা নাই অশ্লীলতাও নাই" (ক্ষু.স. পৃ.৪৫)। তাই তাঁদের লেখালেখি কতটা শ্লীল বা অশ্লীল, সেই বিচারও একভাবে নিরর্থক। শঙ্খ ঘোষের একটি বক্তব্য এপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে -

> অশ্লীল যারা মনে করে, তারা ঠিক কবিতার বা সাহিত্যের পাঠক নয়, তারা সামাজিক লোকজন। সত্যিকারের পাঠকের কাছে এই 'অশ্লীলতা' কথাটির কোনো মানে হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আপাত-শ্লীলতার মধ্যে দিয়েও বহু লেখা ব্যর্থ হয়, আপাত-অশ্লীলতার মধ্য দিয়েও বহু লেখা উত্তীর্ণ হয়। প্রশ্ন এই ব্যর্থতা আর উত্তীর্ণতার, শ্লীলতা-অশ্লীলতার নয়। (ক্ষু.স. পৃ.৪৮১)

হাংরিদের লেখালেখি থেকেই কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে শঙ্খ ঘোষের এই বক্তব্যকে বুঝে নেওয়া যাক। সুভাষ কুণ্ডুর 'মশামাছি' শীর্ষক রচনাটি থেকে কথকের একটি বয়ান তুলে ধরা হল -

> আয়নায় প্রতিফলিত নিজের চেহারা দেখে ঘাবড়ে যাই। গলার হাড় বেরিয়ে গেছে। গাল দুটো থুবড়ে গেছে। কোমরের হাড় উঁচু হয়ে আছে। বুকের দু'ধারে রিবগুলো গোনা যায়। লিঙ্গটা চুপসে ঝুলছে। দেখেই খুব বিপন্ন-বোধ করি। আমাকে সবচেয়ে কাতর ক'রে দেয় যৌনাঙ্গ। মনে হয় স্ত্রী সহবাসের যোগ্যতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। এরকম আমার প্রায়ই মনে হয়। মনে হলেই উঠে এসে আরশির সামনে দাঁড়াই। (ক্ষু.স. পৃ.৬৯)

নিবিড় পাঠে বোঝা যায় যে, উদ্ধৃত অংশটিতে বার্ধক্যের ছাপে কথকের উদ্বিগ্নতা, বিপন্নতাবোধ কতটা তীব্রভাবে ধরা পড়েছে। বার্ধক্যের ছাপকে মেনে নিতে পারছেন না কথক, এবং মেনে নিতে না পারার যে যন্ত্রণা তা 'বিপন্ন', 'কাতর', 'হারিয়ে ফেলেছি' ইত্যাদি শব্দগুলির প্রয়োগে খুব স্পষ্ট। অশ্লীলতার ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই এখানে। মানুষের শরীর তো আর যৌনাঙ্গ-বর্জিত নয়, ফলত শরীরের কথা এলে অনিবার্যভাবে আসে যৌনাঙ্গের কথা; আসা উচিত। নইলে তা খণ্ডিত থেকে যায়। আয়নায় যখন কথক নিজের চেহারা দেখছেন, তখন গলার হাড় বেরিয়ে যাওয়া, গাল দুটো থুবড়ে যাওয়া, কোমরের হাড় উঁচু হয়ে যাওয়া, বুকের দু'ধারের রিবগুলো বেরিয়ে যাওয়া ইত্যাদির মতোই খুব স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবেই লক্ষ করেছেন যৌনাঙ্গেরও পরিবর্তন। আর 'আমাকে সবচেয়ে কাতর ক'রে দেয় যৌনাঙ্গ' - কথকের এই স্বীকারোক্তিতে অশ্লীলতা বা বিকার খুঁজে বের করাটাই সম্ভবত একধরণের

অশ্লীলতা বা বিকার। শারীরবিদ্যা অনুসারে বলা যায়, যৌনতা আমাদের জীবনের ভরকেন্দ্র। এটা বিশৃঙ্খল হলে আমাদের জীবন ভারসাম্য হারায়। যৌনতাকে এড়িয়ে যাওয়া এক ধরণের জীবন-বিমুখতা বা জীবন-বিরুদ্ধতাও বলা যেতে পারে। হাংরিরা জানেন শরীর কখনোই যৌনাঙ্গকে বাদ দিয়ে নয়। যৌনাঙ্গ তাঁদের কাছে হাত-পা-চোখ-মুখ-মাথা-পেটের মতোই একটি অঙ্গ। তাই হাংরি কবিতায় আমরা দেখতে পাই এমন পঙ্‌ক্তি -

> আমি একজন ক্রীতদাস
> আমার হাত-পা-চোখ-মুখ-মাথা-পেট-যৌনাঙ্গ বা শরীর
> জন্মাবধি শেকল ও তালা দিয়ে আঁটা ('ক্রীতদাস' – জামালউদ্দিন, ক্ষু.স. পৃ.৫৭৬)

এখানে কি কবি যৌনতাকে টেনে আনার জন্যই যৌনাঙ্গের উল্লেখ করেছেন? নাকি উদ্ধৃত অংশটির দ্বিতীয় লাইনেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে 'শরীরে'র ডিটেলিং করতে গিয়ে মানবশরীরের অন্য যে কোনো অঙ্গের মতোই অনিবার্যভাবে এসেছে যৌনাঙ্গের উল্লেখ। জীবন কখনই যৌনতাবর্জিত নয়, খুব সাবলীলভাবে হাংরিরা তাই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, 'কেবলি কি বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে যাবো পর্ণোগ্রাফির বদলে' (ক্ষু.স. পৃ.২২২)। আপাতভাবে যৌনগন্ধী শব্দের প্রয়োগে এমন কোনো বক্তব্য প্রকাশ পেতে পারে, যার সঙ্গে যৌনতার কোনো সম্পর্কই নেই। আবার ঠিক উল্টোটাও হতে পারে; একটিও মাত্র আপাত যৌনগন্ধী শব্দ ব্যবহার না করে লেখক তৈরি করে ফেলতে পারেন একটি যৌন-ভাষ্য। আমরা উল্লেখ করতে পারি John Cleland-এর ১৭৪৮ সালে প্রকাশিত 'Memoirs of a Woman of Pleasure' বা সংক্ষেপে 'Fanny Hill' উপন্যাসটির কথা, যে উপন্যাসটিকে চিহ্নিত করা হয় 'the first original English prose pornography, and the first pornography to use the form of the novel'[৭] হিসেবে; 'One of the most prosecuted and banned'[৮] সেই উপন্যাসে কিন্তু একটিও তথাকথিত অশ্লীল শব্দ নেই - "The text has no 'dirty words' or explicit scientific terms for body parts, but uses many literary devices to describe genitalia. For example, the vagina is sometimes referred to as 'the nethermouth'."[৯] আমরা হাংরিদের লেখাতেও মাঝে মাঝে পেয়ে যাই এমন অংশ -

> বউ-এর দিকে মুখ করে মুচকি হেসে মেয়েকে বলি – 'তোর মা আসার পরই আমার চেহারা এই রকম পটকে গেছে।' বউ ভ্রু কুঁচকে হাসি হাসি মুখ করে বলে – 'আমার চেহারাও ছোটোবেলায় খুব ভালো ছিল। ... এই রকম রোগা-প্যাটকা ছিলাম নাকি?' পরে কানের কাছে মুখ এনে বলে – 'তুমিই তো করেছো।' ('কলিকাতা ভ্রমণ' - অবনী ধর, ক্ষু.স. পৃ.১৬৯)

তথাকথিত যৌনগন্ধী শব্দ বলে দেগে দেওয়া হয় যে শব্দগুলিকে, তেমন একটিও শব্দ নেই এখানে; অথচ যে বক্তব্যটি বা ভাবটি প্রকাশ পেলো তার সঙ্গে যৌনতার একটি খুব নিকট সম্পর্ক রয়েছে। আবার অন্যদিকে 'আনন্দে' কবিতায় নির্মল হালদার যখন বলেন -

> মাঠ অর্থাৎ মাটির সঙ্গে লাঙ্গলের সংযোগকে, কে না বলবেন
> যৌনানন্দ? (ক্ষু.স. পৃ.৪৪২)

তখন সেই কবিতায় পাঠক যৌনতাকে বুঝবেন নাকি 'Fertility Cult'-কে বুঝবেন, তা একান্তভাবে পাঠকেরই রুচির ওপর নির্ভর করে। 'The Naked Lunch' রচয়িতা উইলিয়াম বারোজের একটি সাক্ষাৎকার ক্ষুধার্ত সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছেন -

> অন্যান্য মানবশক্তির প্রকাশগুলির মতোই যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে নোংরা করে অবমূল্যায়ন ঘটান হয়েছে, বা একেবারে অমানবিক প্রয়োজনে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই সমস্তই ছুঁৎমার্গীয় ব্যাপার। কবে যে আমরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে যৌনতাকে বুঝতে পারব, কবে আমরা বিষয়টাকে তদন্ত করতে পারব। এ সম্পর্কে যেমন ভাবাও হয় না, লেখাও হয় না। ... যৌন বিষয়ে একাধারে রয়েছে ছুঁৎমার্গীরা, অন্যদিকে প্রচণ্ড ভয়। আসলে আমরা যৌন বিষয়ে কিছুই জানি না। (ক্ষু.স. পৃ.৩২৮-৩২৯)

সত্য গুহ হাংরিদের লেখায় তথাকথিত অশ্লীলতাকে বুঝেছেন 'ভান ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাদের ক্ষমাহীন আক্রমণ'[১০] হিসেবে। যুগান্তর পত্রিকাও হাংরিদের লেখালেখিকে অশ্লীল বলতে নারাজ ছিল, যদিও সে'কথাটি স্পষ্টভাবে না বলে খানিকটা ঘুরিয়ে বলা হয়েছিল এভাবে -

> যে দেশে বাৎসায়ন ও কল্যাণমল্লের গ্রন্থ শাস্ত্র বলিয়া কথিত, গীতগোবিন্দ ধর্মায়তনের ধুমধূনায় সম্মানিত, উড়িষ্যা খজুরাহের শিল্প যে দেশে নিঃসঙ্কোচে রসশৈলীরূপে বিবেচিত আর তন্ত্র-ব্যবস্থিত মোক্ষ সন্ধানের উপায়রূপে বিন্দু সাধনাদি অশেষ মর্যাদায় গৃহীত, সে দেশে এই নাবালকবৃন্দ নূতন কথা এমনকি বলিয়াছে... (ক্ষু.স. পৃ.১৪৯)

যাপন-অভিজ্ঞতা

তবুও 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটির জন্য অশ্লীলতার দায়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়; "কলকাতার পুলিশ পাটনায় গিয়ে মলয় রায়চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ ইন্সপেক্টররা রিকশায় বসলেন এবং মলয়কে হাতে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে চোর ডাকাতের মতন রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে বহু লেখাপত্র নষ্ট করে দেওয়া হল। ফাইল, বইপত্র, টাইপরাইটার ইত্যাদি বগলদাবা করে

কলকাতায় নিয়ে গেল লালবাজার পুলিশ, যা আর পরে ফিরে পাননি।"[১১] এই সময়ে বিপদ বুঝে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে মুচলেকা দিয়ে অনেকেই কেটে পড়েন, যে কারণে মলয় রায়চৌধুরী বলেন ১৯৬৫ সালে এই আন্দোলন ফুরিয়ে যায়। অবশ্য কিছুদিন পরেই তাঁর সেই বন্ধুরা আন্দোলনের স্রষ্টার দাবিদাওয়া নিয়ে আবার আসরে নামেন, হাংরি শব্দকে বর্জন করে 'ক্ষুধার্ত' নাম নিয়ে। ইতোমধ্যে মলয় রায়চৌধুরী যতটা জখম হওয়ার তা হয়েছেন; যাঁদের তিনি বন্ধু ভেবে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হাংরি আন্দোলন মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। আদালতে দিনের পর দিন হাজিরা দিয়েছেন কবি মলয় রায়চৌধুরী। হাস্যকর হলেও সত্যি, এদেশের আইন বিচার করেছে কবির সেই কবিতাকে, যে কবিতাটি পরবর্তীকালে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন হাওয়ার্ড ম্যাককর্ড 'Stark Electric Jesus' নামে, যেটি প্রকাশ পায় ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে।[১২] তাই ১৯৬৫ তে যখন তাঁর 'জখম' কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন তাতে শোনা গেলো এক অনন্ত ক্ষুব্ধ আহত অস্থির কণ্ঠের স্বর। আহত এক কবি তাঁর ক্ষতচিহ্নগুলিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এখানে। জখম ভর্তি কবি-হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়েছে এই দীর্ঘ কবিতাটি; এতটাই দীর্ঘ যে একটি পৃথক কাব্যগ্রন্থ হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়েছে। 'জখম' একটি কাব্যগ্রন্থ, একটি কবিতা, একটি মাত্র বোধের সম্প্রসারণ –

চাঁদোয়ায় আগুন লাগিয়ে
তাঁর নীচে শুয়ে আকাশের উড়ন্ত নীল দেখছি এখন
দুঃখ কষ্টের শুনানি মুলতুবি রেখে
আমি আমার সমস্ত সন্দেহকে জেরা কোরে নিচ্ছি
হাতের রেখার ওপর দিয়ে গ্রামোফোনের পিন চালিয়ে জেনে নিচ্ছি
আমার ভবিষ্যৎ
(ম.রা.চৌ.ক. পৃ.১৯৩)

'শুনানি', 'মুলতুবি', 'সন্দেহ', 'জেরা' – এই শব্দগুলি উঠে এসেছে কবির সেই দিনগুলির যাপন-অভিজ্ঞতা থেকে। নিজের অন্তঃস্থল খুঁড়ে কবিতা লিখে গিয়েছেন কবি। পৃথা রায়চৌধুরী 'মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন -

> এই কবি তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর 'কবিতা পায়', ঠিক মানুষের বাকি সব পাওয়ার মতোই কবিতাও পায়। কবিতার সাথে কতটা ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হলে, একাত্মতা থাকলে এবং কবিতার প্রতি একনিষ্ঠ থাকলে, কেউ এই কথা বলতে পারেন, তা সাধারণের পক্ষে বোঝা হয়তো দুষ্কর।[১৩]

তৎকালীন সমস্ত রকমের অসহিষ্ণুতা এবং অস্থিরতা ফুটে উঠেছে এই জখম ভর্তি কবিতায়। হাজিরা দিতে দিতেই কবি মলয় রায়চৌধুরী দেখে ফেলেছেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের চত্বরে কীভাবে আইনের মারপ্যাঁচের খেলা অভিনীত হয়; দেখেছেন আদালত চত্বরেই ভাড়া পাওয়া যায় সাক্ষী। কবিতাটি জুড়ে দেখা যায় কবি তাঁর সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের পরিচালক, নিজের আর্থিক ও রাজনৈতিক যাপনের পর্যবেক্ষণ থেকে উঠে আসা জীবনের খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সরাসরি রাষ্ট্রকে, প্রতিষ্ঠানকে অবিরাম আক্রমণ করে গিয়েছেন কবি। তাঁর 'রাষ্ট্রের বহি-খাতা' কবিতায় এক মোক্ষম প্রশ্নের সম্মুখীন হই আমরা। আমাদের নাগরিকত্ব, আমাদের স্বদেশের শেকড় কি কেবল সরকারের ঠাপ্পা মারা কয়েক টুকরো কাগজের মুখাপেক্ষী? তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে উঠে আসে আমাদের তুচ্ছতা। আপাতভাবে যা শুধু কবির দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির লঘু বর্ণনা, তা আসলে গভীরে ঢুকে নাড়া দেয় আমাদেরকে। এভাবেই প্রতিদিনের জীবনযাপন ও অভিজ্ঞতার মিশেলে হাংরিরা আমাদের সামনে তুলে ধরেন আমাদেরকেই, আমাদের জগৎটিকেই।

হাংরি গদ্যকার সুভাষ ঘোষের 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট' রচনাটিও লেখকের একান্ত নিজস্ব যাপন-অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। ডায়েরির আকারে রচিত এই লেখাটিতে সুভাষ ঘোষ নিজেকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখিয়েছেন আমাদের লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম-ভালোবাসা, হিংসা, সর্বোপরি ধর্ষকামী মানসিকতা। লেখক মনে করেন, আমাদের জীবন আসলে এক যুদ্ধ, এবং আমরা এক একজন যোদ্ধা। সমস্ত রকম প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাঁর এই টিকে থাকার যুদ্ধ। 'রাষ্ট্র' নামক প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখে 'পরিবার' নামক একটি প্রতিষ্ঠান, যার জন্ম হয় 'বিবাহ' নামক এক ভয়ঙ্কর প্রাতিষ্ঠানিক প্রথার মাধ্যমে। সুভাষ ঘোষের কাছে এসবই যুদ্ধ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পরিবার হল সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। এই যুদ্ধটা সবচেয়ে কঠিন, এবং এই যুদ্ধে জেতা যায় না; এই যুদ্ধে আমরা সকলেই পরাজিত। তবুও আমরা সকলেই এই যুদ্ধ করে যাই। কার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ, কার জন্য এই যুদ্ধ, কী উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ – কিছুই জানি না আমরা। এই রচনার শেষে তাই লেখক বলছেন, "still অদ্ভুত এই ঠাণ্ডা যুদ্ধ, জটিল খাদ্যনীতি এই, এই স্ত্রীসহবাস, অজ্ঞাত কারণে আমার বেঁচে থাকা –"[১৪] আসলে সমস্ত যুদ্ধই তো হয় অজ্ঞাত কারণে। এছাড়া ফাল্গুনী রায়, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখ হাংরি কবি, কিংবা সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রমুখ হাংরিগদ্যকারদের সমস্ত লেখালেখিই তাঁদের নিজস্ব যাপন-অভিজ্ঞতা থেকে লেখা, তাঁরা তাতে কল্পনার রঙ লাগতে দেননি কখনো।

রাজনৈতিক হীনতা ও অক্ষম 'রাষ্ট্রে'র সন্ত্রাস

হাংরিরা নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন তৎকালীন হীন রাজনীতিকে, ঘুণ ধরা সমাজের এঁদোকানা সমস্ত ওলিগলিকে। উত্তরবঙ্গের হাংরি কবি অরুণেশ ঘোষ তাঁর 'মানুষের বিরুদ্ধে মানুষ' কবিতায় বলছেন -

একতলায় সোনার দোকান, দোতলায় ব্যাঙ্ক
তিনতলার ঘরে কমিউনিস্টপার্টি অফিস, প্রকাশ্য ও আনন্দময়
উৎসবের কালো কালো মাথাগুলো থেকে উঠে গ্যাছে
সোজা ও সরল পতাকা – ওড়ে, লাল, মধ্যবিত্তের ফেসটুন
এখানে খাদ্যের দাবিতে আর মাইনে বাড়াবার লোভে নড়ে ওঠা
বিপ্লবের ভ্রূণ দুই হাতে ছাড়িয়ে এনেছে, রক্ত ঝরতে দিয়েছে দর্শক
মৃত্যু অবধি – এ শবযাত্রা নিয়ে আসা দূরান্তর থেকে দিন মজুরের মুখ
কৃষকের রক্তিম ও ঘোলাটে চোখ ভিক্ষে করে ভাড়া করে প্রতারণা করে
নিয়ে আসা এই কপট ও শৌখিন মিছিলের শোভা বর্ধনের জন্যে... (ক্ষু.স. পৃ.৩৯৭)

একতলায় সোনার দোকান, দোতলায় ব্যাঙ্ক আর তার ওপরে তিনতলায় পার্টি অফিস; অর্থাৎ রাজনীতির ভিত রচনা করেছে পুঁজি। যে রাজনীতিতে দূর-দূরান্তর থেকে দিনমজুর, কৃষকদেরকে প্রতারণা করে নিয়ে আসা হয় কপট ও শৌখিন মিছিলের শোভা বর্ধনের জন্য। ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্ষুধার্ত মানুষকে মরে যেতে দেখেছেন তাঁরা, এমনকী তারপরেও সেই মৃতব্যক্তির নামে ভোট পড়তেও দেখেছেন - "ভোট দিতে গিয়ে একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে আমি মরে যেতে দেখেছিলুম/ভোটের লাইনে কিন্তু তার নামেও প্রক্সি পড়েছিল" (ক্ষু.স. পৃ.২৮৪-২৮৫); অথচ "আমরা ভোটের জন্যে রাজনীতির বদলে চেয়েছিলুম/ রাজনীতির জন্যে ভোট" (ক্ষু.স. পৃ.৪০৫)। এহেন নোংরা রাজনীতিতে অনেক ঘটনাই ঘটে যায়, কিন্তু যোগ্য চাকরিপ্রার্থী চাকরি পায় না -

অনেক ঘটনা ঘটে গ্যাছে কিন্তু আমি তবু চাকরি পাইনি
তাই বউ পাইনি
হিহিহিহিহি
টাকা না দ্যাখালে বেশ্যার দালাল ও পাত্রীর অভিভাবক
কেউই তাদের মেয়েদের ছেড়ে দ্যায় না আমাদের হাতে
কিন্তু এই গণিকা সভ্যতার ছাই গায়ে মেখে আমরা কি সবাই
ল্যাঙটের তলায় লিঙ্গ গুটিয়ে রেখে সন্ন্যাসী হয়ে যাবো?
(ক্ষু.স. পৃ.২৮৪-২৮৫)

পাঠক হিসেবে আমরা অবাক হয়ে যাই যে, কোনো একটি মানদণ্ডে বেশ্যার দালাল ও পাত্রীর অভিভাবক এক হয়ে যেতে পারে। 'ল্যাঙটের তলায় লিঙ্গ গুটিয়ে রেখে সন্ন্যাসী হয়ে যাবো?' এই জিজ্ঞাসা আমাদেরকে হতবাক করে দেয়। এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে ঘুণ ধরা সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি, যে রাষ্ট্রব্যবস্থা এই ধরণের প্রশ্নের মুখে বিপন্ন বোধ করে; আর তাই অশ্লীলতার অভিযোগ এনে মুখবন্ধ করে দিতে চায় এইসব প্রশ্নকারীদের।

হাংরিরা যখন লেখালেখি শুরু করছেন, তখন সেই ষাটের দশকের অব্যবহিত আগে '৫৯-এ আমরা দেখি খাদ্য-সংকট; দুমুঠো ভাতের জন্য মানুষের হাহাকার। এরপর '৬৬ সালে আবার সেই একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি। মলয় রায়চৌধুরী 'হাংরি' শব্দটির মূলে মূলত 'আত্মিক ক্ষুধা'র কথা বললেও, আমরা শৈলেশ্বর ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ প্রমুখের লেখায় কিন্তু পেটের খিদের কথা পাই। সুভাষ ঘোষের 'ব্যানড ডায়েরির পাতা'য় দেখি এক উদ্বাস্তু ক্ষুধার্ত রেশন কার্ড জোগাড় করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে, কারণ তাকে খাওয়ার জন্য চাল, গম সংগ্রহ করতে হবে। সুভাষ ঘোষ জানতেন ক্ষুধা কাকে বলে, তিনি জানতেন আসল আগুন তো জ্বলে ক্ষুধার্ত মানুষদের পেটের ভেতরে। তাই এই রচনায় দেখি, সেই ক্ষুধার্ত লোকটি, যে রেশন কার্ড সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি, সে দমকলে খবর দিয়েছে পেটের আগুন নেভাবে বলে –

> "ভিড়ের লোকজনদের জিজ্ঞেস করে ব্যাপার যেটুকু জানা যায় – ফায়ার ব্রিগেড দাঁড়িয়ে পড়েছে – রেডি অফিসার, রেডি সারভিসম্যান, জল, গ্যাস, পাইপ সব কিছু – কিন্তু আগুন কোথায়? ধোঁয়া কোথায়? গাইড কই। কোথাও নেই কিছু। অফিসার লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল। কল কে দিয়েছে, আগুন কোথায়, কেউ বলতে পারল না। অবাক সবাই।
>
> এক সময় অফিসার সেই লোকটাকে ল্যাম্প পোস্টের পাশে সন্দেহজনক ভাবে দেখতে পায়। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ – সে নিজেই ফায়ার ব্রিগেডে কল পাঠিয়েছে স্বীকার করে। বলে, তার পেটে ভয়ানক আগুন লেগেছে এবং সে সেই আগুন নেভাতে চায় বলেই দিয়েছে কল।"[১৫]

যে 'রাষ্ট্র' ক্ষুধার্তের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারে না, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার অক্ষমতাকে চূড়ান্ত ব্যঙ্গ করেছেন লেখক খিদের আগুন মেটাতে দমকলবাহিনীকে ডেকে।

আবার অবনী ধরের 'ভাতের জন্য শ্বশুরবাড়ি' গল্পের শুরুতেই কথক বলছেন –

> দশটা টাকা জোগাড় করে দু'সপ্তাহ আগে রেশন তুলেছিলাম। গতকাল রেশন তোলার লাস্ট ডেট গেছে। ভাবলাম বউ-ছেলেমেয়েকে কয়েক মাসের জন্য শ্বশুরবাড়ি রাখে আসতে পারলে অন্তত দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবে। (ক্ষু.স. পৃ.২৭৯)

অর্থনৈতিক বিপন্নতা মানুষের একান্ত যত্নে লালিত সম্পর্কগুলিকেও কীভাবে কদর্য রূপ দেয়, তা এই গল্পে খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন লেখক। এই গল্পে দেখি বিবাহিত মেয়ের বাপের বাড়িতে আসাটা কেউ সুনজরে দেখছে না, এমনকি মা-বাবাও খুশি নয়। অথচ বিবাহিত মেয়ের বাপের বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটি বাঙালি সমাজে একটি কাল্ট। মেনকা-উমার সম্পর্কের মাধুর্য উপভোগ করে আসা শাক্তপদাবলির আপামর বাঙালি পাঠক এই গল্পের মা-মেয়ের সম্পর্ককে কীভাবে বুঝবেন, তা কল্পনা করা যায় না। এই গল্পে আমরা দেখি, মা মেয়েকে বলছে 'জায়গা নেই বাসা নেই, হুট করে চলে এলি – একটু আক্কেল বিবেচনা তো থাকা দরকার।' (ক্ষু.স. পৃ.২৭৯) সবার অনিচ্ছায় যখন কিছুতেই থাকা হয়ে ওঠে না, তখন ফেরার সময় গল্পের শেষে দেখি কথক বলছেন –

> শ্বশুরই টিকিট কেটে দিল। গাড়ি ছাড়ার পর বউ হাসতে হাসতে আমাকে বালতি ব্যাগের তলাটা দেখায়। হাত দিয়ে দেখি চাল। বউ চৌকির তলা থেকে সরিয়ে এনেছে। ইচ্ছে করছিল, বউকে সাপটে ধরে চুমু খাই। অত লোকজনের মধ্যে কী আর তা হয়! বউকে হাতটা শুধু চেপে ধরে বললাম ... 'সাবাস সাবাস!' (ক্ষু.স. পৃ.২৮২)

আর্থিক সংকট যেমন মানুষের সম্পর্কগুলিকে নগ্ন করে দিয়ে একটা কদর্য রূপ বের করে এনেছে, তেমনই ব্যক্তিমানুষের মূল্যবোধ, সততা এসবকে যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। 'ক্ষুধার্ত' দ্বিতীয় সংকলনে অবনী ধরের 'কলিকাতা ভ্রমণ' গল্পে আমরা দেখি গল্পের কথক চেনা-জানা এক ওষুধের দোকান থেকে বাকিতে টনিক নিয়ে, সেটা দূরের আরেকটি দোকানে এক টাকা কমে বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে গম কিনে বাড়ি ফেরে। এছাড়া 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার প্রচ্ছদ জুড়েও আমরা 'ক্ষুধা'রই বিভিন্ন চিত্ররূপ দেখেছি।

ষাটের দশকে আমরা ভারতকে দুটি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে দেখি। প্রথমে '৬২-এর ভারত-চীন যুদ্ধ, যা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল। এরপর রয়েছে '৬৫-এর ভারত-পাক যুদ্ধ। কেবল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গেই নয়, দেশের ভেতরেও চলছিল যুদ্ধ, ১৯৬৭ সালে তারই বিস্ফোরণ হল নকশালবাড়ির ঘটনা। এইরকম যুদ্ধের আবহে মলয় রায়চৌধুরীর 'জেব্রা' পত্রিকার পাতায় বেরলো সুভাষ ঘোষের 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট' রচনাটি, যেখানে লেখক যুদ্ধকে আবিষ্কার করেছেন আমাদের ব্যক্তিজীবনের পরিসরে।

সর্বোপরি ষাটের দশকের পশ্চিমবঙ্গ মানেই বিগত কয়েক দশকের জমে থাকা ক্ষোভ উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৭তে 'নকশাল' নামাঙ্কিত হয়ে যাওয়া -

সব মিলিয়ে এক তুমুল অস্থিরতা। আদতে কৃষক আন্দোলন হলেও, নকশাল আন্দোলনে শ্রমিক, ছাত্রসহ মধ্যবিত্ত মানুষের অংশগ্রহণে তা সামগ্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল। আর তাই এই আন্দোলনকে দমন করতে 'রাষ্ট্র'ও কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিল। মলয় রায়চৌধুরীর 'আলো' কবিতায় সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের রূপকে এভাবে তুলে ধরেছেন কবি -

আবলুশ অন্ধকারে তলপেটে লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ি
পিছমোড়া করে বাঁধা হাতকড়া স্যাঁতসেঁতে ধুলোপড়া মেঝে
আচমকা কড়া আলো জ্বলে উঠে চোখ ধাঁধায়
তক্ষুনি নিভে গেলে মুখে বুটজুতো পড়ে দুতিনবার
কষ বেয়ে রক্ত গড়াতে থাকে টের পাই (ম.রা.চৌ.ক. পৃ.১৭৪)

তৎকালীন নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যে কোনো সময়ে যে কোনো কাউকে তুলে নিয়ে গিয়ে যেভাবে অকথ্য অত্যাচার করা হতো, তারই একটি চিত্র আমরা পাই এই কবিতায়। পিছমোড়া করে বেঁধে অন্ধকার ঘরে অবিরত লাথি মারা হয়েছে কতশত তরুণ যুবককে; কেবল 'রাষ্ট্রে'র প্রতি আঙুল তুলেছে বলে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ওপর যথেষ্ট ভরসা করতে পারেনি বলে। রাষ্ট্রের মুখোশের আড়ালে থাকা আসল পুঁজিবাদী মুখটিকে তাঁরা দেখে ফেলেছিল বলে, হাজার-হাজার ওয়াটের আলো দিয়ে কত চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল! মহাশ্বেতা দেবীর 'নন্দিনী' সেভাবেই অন্ধ হওয়া এক তরুণী। প্রতিবাদী হলেই, প্রথা ভাঙার চেষ্টা করলেই কী কী ঘটে, তা ধরে রেখেছে এই 'আলো' কবিতার প্রতিটি শব্দ। প্রতিবাদী কবিকণ্ঠে কবিতার শেষে উচ্চারিত হয় -

একসঙ্গে সব আলো আরেকবার নিভে গেলে
পরবর্তী আক্রমণ সহ্য করার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিই (ম.রা.চৌ.ক. পৃ.১৭৪)

প্রতিবাদী হলে তার শাস্তি কতটা অমানবিক হতে পারে, তার একটি চিত্র আমরা পাই ফাল্গুনী রায়ের 'কবিতা বুলেট' কবিতাতেও -

আর কত সত্যিকারের সতী মেয়ে বিপ্লবের কারণে
যৌনাঙ্গে বহন করে পুলিশের চুরুটের ছ্যাঁকা
তাদের প্রেমিকরা কেরিয়ারিস্ট হতে না পারায় সমাজের চোখে
বনে যায় বোকা
আর চালাক পাঁঠা কবিদের ভিড়ে ভরে ওঠে কফিহাউস
বঙ্গ সংস্কৃতির প্যান্ডেল উঠিয়ে নিলে পর
ময়দানের সে জায়গায় চরে বেড়ায় ভেড়া ... (ক্ষু.স. পৃ.৫৫০)

মেকি সমাজ ও সভ্যতা

সমস্ত অবিচারের জবাব যেন কবি দিতে চেয়েছেন এই 'কবিতা বুলেট'-এ। তাঁরা দেখেছেন সেই ভণ্ড মেকি সমাজকে, যে সমাজ কেরিয়ারিস্ট হতে পারাকেই জীবনের সার্থকতা মনে করে; যে সমাজে যেখানে ভেড়া চড়ে বেড়ায় সেখানেই বসে সংস্কৃতির প্যান্ডেল; যে সমাজে অধিকাংশ শিল্প 'ক্ষতস্থানের পুঁজ' এবং 'রক্ত চুঁইয়ে পড়ার মতো শিল্পের উল্লাস' (ক্ষু.স. পৃ.৩৯৫); যে সমাজ 'মেয়েদের নষ্ট করে এবং নষ্টা বলে' (ক্ষু.স. পৃ.৮৯)।

হাংরিরা আসলে সমস্ত কিছুকেই দেখতে চেয়েছেন নগ্ন চোখে। এই নগ্ন চোখেই তাঁরা দেখে ফেলেন কলকাতা শহরের বাবুদের নির্জীব চেহারা, যে শহরে 'কোনদিক পুব আর কোনদিক পশ্চিম তা বোঝা যায় না। ... ভূগোল পড়ে জানতে হয়' (ক্ষু.স. পৃ.১৬৮) -

> শিয়ালদা নেমে বউ-ছেলে-মেয়ে মিলে পেচ্ছাপ-টেচ্ছাপ সেরে নিলাম। বাইরে এসে মুচি খুঁজছি। এখন কি মুচি আসে? ট্রাম-বাস সব ফাঁকা ফাঁকা। ইলেকট্রিক তারের উপর সারি সারি কাক বসে আছে। টং টং ঘন্টা বাজিয়ে 'খবদ্দার খবদ্দার' বলতে বলতে রিকশা ছুটছে। রিকশার বাবুদের দেখে মনে হলো – সারারাত কলকাতাকে পাহারা দিয়ে ফিরছে। (ক্ষু.স. পৃ.১৬৮)

আবার অরুণেশ ঘোষের 'এই আমার শহর' কবিতায় একজন হাংরি কবির চোখে তাঁর শহরের পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে –

> ১টি বেশ্যা পল্লি রয়েছে এই শহরে
> আর আছে ১ জন সাধু
> ১টি মাত্র সরকারি পেচ্ছাপখানার পাশে
> আড্ডা জমায় ১ দল গেঁজেল
> ধ্বসে পড়া আর ভাঙ্গা ১টা সিনেমা হল
> আর আছেন ১ জন ইন্টেলেকচুয়াল
> পোস্টারে লেংটিপরা মেয়েছেলে (ক্ষু.স. পৃ.২৭৫)

কবিতার শেষে দেখি, কবি দেখেন শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে কেবল কালো ধোঁওয়া।

হাংরি গদ্যকার সুভাষ ঘোষ তাঁর 'আমার চাবি' গ্রন্থের 'হাঁসেদের প্রতি' রচনায় পুঁজিবাদী সভ্যতার অন্দরের প্রকৃত ছবিটি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, আমরা সকলেই এই বুর্জোয়া সভ্যতার হাঁস হয়ে গিয়েছি। হাঁসেদের মতো কেবল ডিম পাড়ার মধ্যেই আমাদের উপযোগিতা। যত দিন ডিম উৎপাদন করে যেতে পারবো, তত দিনই আমাদের বাজারমূল্য।

বুর্জোয়া এই সভ্যতা আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিঙরে নিয়ে, ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়; এটাই তার একমাত্র লক্ষ্য –

> "আমার মাথার ভেতরে পূর্বের দশগুণ শব্দে ডেকে ওঠে টারবাইন। যথেচ্ছাচারে নিমগ্ন হাঁসগুলির দিকে তাকিয়ে কেবলি মনে হতে থাকে, আমি কত উপায়ে কত বেশি সংখ্যক উপায়ে তাদের থেকে কত ডিম, কত বেশি সংখ্যক ডিম আদায় করে, তাদের পালকহীন রুগ্ন মলিন করে, কখন কত সময় বাদে তাদের পদ্মদিঘি থেকে টেনে বের করে দেবো এবং আমি নিশ্চিত তা করবো, আমার এই প্রতিজ্ঞা – এই একমাত্র প্রতিজ্ঞা – ক্রমাগত, ক্রমাগত জেগে ওঠে প্রপাত শব্দে, টারবাইন ব্লেডে।"[১৬]

এভাবে সুভাষ ঘোষ তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত আক্রমণ করে গিয়েছেন পুঁজিবাদী সভ্যতার ভণ্ডামিকে। আবার সুবিমল বসাক তাঁর 'ছাতামাথা' গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন এক যুবকের পাওয়া, না পাওয়া, তার প্রেম-ভালোবাসা, অস্থিরতা, শরীর, যাপন, আত্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদির অনুষঙ্গ –

> "একেক সময় আমার মনে হয়, আমার য্যান কিচ্ছু নাই – শরীলের চামড়া হাড়গোড় মাথা বুক বেবাক কিছু গতর থিক্যা আলগা হইয়া ইদিক-পদিক ছিতরাইয়া আছে। আমার ভিতরে তহন আর আমারে পাই না। নিজেরে তন্নি তন্নি কইর‍্যা বিচড়াইতে থাকি, কোঠার দেয়ালগুলান চাইরো দিশা থিক্যা ঠেইল্যা ধরে – য্যান একলগে খাইতে আহে আমারে।"[১৭]

মধ্যবিত্তের ভণ্ডামি

হাংরিরা আসলে কোনো রকমের ভণ্ডামি, মেকিপনাকে সহ্য করতে পারেননি। মধ্যবিত্ত ইডিয়োলজিকে চূড়ান্তভাবে ব্যঙ্গ করেছেন কবি ফাল্গুনী রায় তাঁর 'আমার বাইবেল আমার রাইফেল' কবিতায় –

> গেঞ্জি লুঙ্গি পরে রকে বসে বিড়ি খেতে খেতে
> আমরা শুনে যাবো নির্বিকার
> রবীনঠাকুরের গান – (ক্ষু.স. পৃ.২২২)

আবার বাসুদেব দাশগুপ্তের 'বাবা' রচনাটিতে তুলে ধরা হয়েছে বাড়ির বেঁচে যাওয়া বাসি-পচা খাবার বাড়ির ঝি-চাকরের পাতে তুলে দেওয়ার মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে –

> মুখ ধুতে ধুতে পরিতোষ দেখতে পায় রান্নাঘরের পিছনে ঝি তার সকালের বরাদ্দ রুটিটুকু নিয়ে খাচ্ছে। ভাগের আশায় মাকে ঘিরে গোল হয়ে তার তিন ছেলেমেয়ে। কয়েকটা কাক যেন রুটির টুকরো নিয়ে কামড়া-কামড়ি করছে। পরিতোষ জানে খাবারের বাসি, পচা,

পরিত্যক্ত অংশটুকু ঠিক ঠিক ওদের পাতে চলে গেছে। এ ব্যাপারে বাড়ির মেয়েদের কখনই কোনো ভুল হয় না। (ক্ষু.স. পৃ.৩৫৩)

এছাড়া তাঁর 'বমন-রহস্য', 'রিপুতাড়িত' ইত্যাদি গল্পগুলি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আবার সুভাষ ঘোষ তাঁর 'থ্রু গাড়ির টিকিট' রচনায় মধ্যবিত্তের ভণ্ডামির মুখোশটি টেনে খুলে দেওয়ার পাশাপাশি পুরুষতন্ত্রের প্রকৃত চেহারাটিও তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্ত পুরুষেরা যতই লম্পট, চরিত্রহীন হোক না কেন, বিবাহের প্রাক্কালে কনেপক্ষের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন, সারা পৃথিবী খুঁজেও এমন হীরের টুকরো সুপাত্র আর পাওয়া যাবে না। এই রচনায় এমনই এক পুরুষ চরিত্র হল 'সুভাষ'; লক্ষণীয়, লেখক সুভাষ নিজের নামেই এই চরিত্রটিকে নির্মাণ করেছেন। এই সুভাষ চরিত্রটির স্বগতোক্তি থেকে খানিকটা অংশ তুলে ধরা যাক –

"একবার এক তুতো বউদির বুকের উপর এক লেপের নীচে রাত কাটাই – এক সময় বাথরুমের ফুটোয় কত কত দিন চোখ রাখতাম – নিরুদির স্নান দেখতাম – সেকেণ্ড মাস্টারমশায় অনেস্ট সার্টিফাই করার পুরস্কার পাওয়া গিয়েছিল – ওঁর মেয়ে গৌরীর পড়া দেখিয়ে দিতে দিতে কতদিন ওর ফাঁকা ফ্রগের ফুটোর ভেতরে চোখ ঢুকিয়ে দিতাম, সিঁড়ির নীচে ওকে জড়িয়ে কত বহুবার হামলিয়ে হামলিয়ে চুমু খেয়েছি"[১৮]

অথচ বিয়ের আগে 'দেখাই যেন আমি প্রথম-পুরুষ'। এই সুভাষ চরিত্রটি যার ইতোপূর্বে তিন তিনটি প্রেমিকা ছিল, অথচ তারা কেউ কারোর কথা জানে না, জানবে না কোনো দিন; সেই 'বেকার' সুভাষের বিয়ে হতে চলেছে বড় কন্ট্রাক্টর প্রমীলবাবুর 'মেমসাহেবের মতো' দেখতে বি.এ. পাশ মেয়ের সঙ্গে। এই প্রমীলবাবুর সরকারি মহলে হাত নেহাত কম নয়, ফলত সুভাষের চাকরি হয়ে যাবে, 'নিজস্ব বাড়িও হয়তো সময়কালে হয়ে যেতে পারে'। লেখক এভাবেই বিদ্রূপের চাবুকে, চূড়ান্ত তামাশায়, নিতান্ত তুচ্ছতায় উলঙ্গ করতে থাকেন মধ্যবিত্তের সযত্নে লালিত তথাকথিত মূল্যবোধ, রুচিবোধের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল চেহারাটিকে।

আবার অবনী ধরের গল্পগুলিতে উঠে এসেছে মানুষের নগ্ন নীচতার আরেক রূপ। 'ক্ষুধার্তে'র প্রথম সংকলনে প্রকাশিত 'আমার দুঃখী মা' গল্পে কথকের বাবা চরিত্রটিতে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র। গল্পের শুরুতেই বলা হয়েছে যে –

মাঝে মাঝে মাকে মারধরও দিত। ... পাশের এক গ্রামে কোনো ধোপার মেয়ের সঙ্গে বাবার ভাব ছিল। সেখানে সে রাত কাটাতো। মা জানত। ঠাকুমা কোনোদিন আপত্তি করেনি। হঠাৎ

রটে গেল – বাবা নিরুদ্দেশ। সংসার ত্যাগ করে নাকি বৈষ্ণব হয়ে গেছে। এদিকে সেই ধোপার মেয়েটিকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। (ক্ষু.স. পৃ.৫২)

পুরুষের যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে মায়েরা। জগদীশ গুপ্তের 'কলঙ্কিত সম্পর্কে'র বিরাজের মতো, বা 'হাজার চুরাশির মা'-এর সুজাতার শাশুড়ির মতো। কথকের সেই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া বাবা হঠাৎ একদিন বৈষ্ণব বেশে এসে হাজির, সঙ্গে সেই সেবাদাসী। গল্পের শেষে আমরা হতবাক হয়ে যাই কথকের গৃহত্যাগী 'বৈষ্ণব বাবা'র ভণ্ডামিতে –

মা, বাবা আর সেবাদাসী ভেতরের ঘরে শুতে গেল। ভেতরের ঘরে কে কোথায় শুলো তা আমি জানি না। ভোর বেলায় উঠে দেখি আমি ওঠার আগেই বাবা তার সেবাদাসীকে নিয়ে চলে গেছে। ... কিছুদিন বাদে ভবানীপুরে আমার এক পিসতুতো দিদির কাছে শুনলাম – বাবা আর মা খাটে শুয়েছিল আর সেবাদাসী শুয়েছিল নীচের বিছানায়। বাবা নাকি মাকে বলেছিল – তুমি ইচ্ছে করলে আমার উপর উঠে করতে পারো। মা নাকি বলেছিল – 'আমি ওই রকম ভাবে করতে পারি না। (ক্ষু.স. পৃ.৫৯)

উল্লেখ্য, এই কথকের জন্ম ফরিদপুরে, দেশভাগের ফলে এদেশে এসে জাহাজের খালাসির চাকরি নেয়। পরে কলকাতায় একটা মার্চেন্ট ফার্মে চাকরি পায়, কলকাতা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে রিফিউজি কলোনিতে মাকে নিয়ে থাকে। হাংরিদের লেখায় বারবার উঠে আসে এই রিফিউজি মানুষদের কথা। আপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শুকিয়ে যায় কেন' গল্পেও পাই পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কথা।

সভ্যতার অসুখ ও নৈরাজ্য

হাংরিরা দেখেছেন সেই সমাজের এমন সব মানুষকে, 'যাদের মুখাবয়ব ঘৃণ্য, যাদের ভয়ংকর চোখগুলি কপালের নীচে গভীর কোটরে ঢোকানো। তারা পাথরের চেয়েও রূঢ়, ইস্পাতের চেয়ে কঠিন, হাঙরের চেয়ে নিষ্ঠুর, যৌবনের চেয়েও উদ্ধত – ঘৃণ্য অপরাধীর চেয়েও নির্বোধ ও অনুভূতিহীন, চরম ভন্ডের চেয়েও শয়তান, গ্রাম্য ভাঁড়ের চেয়েও উদ্ভট, পুরুত ঠাকুরের চেয়েও চরিত্রবান, চরম অন্তর্মুখী মানুষের চেয়েও এরা আত্মনিমগ্ন, স্বর্গের বা মর্তের শীতলতম প্রাণীর চেয়েও শীতল' (ক্ষু.স. পৃ.৫৪৬); যে সমাজের মানুষের আত্মকথন এরকমও হওয়া সম্ভব -

আর আমি বুঝতে পারি না – টিকিট কিনতে কেন কখনই, কোনোক্ষেত্রেই ভালো লাগে না আমার – পয়সা থাকলেও ইচ্ছে করে না – না থাকলে খুবই বেঁচে যাই – ও যখন টিকিট

ফাঁকি দিচ্ছি বলে কনডাকটর ননস্টপে ঘন্টা টেনে নামিয়ে দেয় এবং আমার পিঠের-মাথার উপর টিটকিরি/গিরগিটি – আরামের কুলকুচি ক্রমাগত ছিটায় উপস্থিত ভদ্রজনেরা, তখন খুবই ভালো লাগে, আরাম লাগে, আমার প্রায় ৩ দিনের আটকে থাকা পায়খানা পরিষ্কার হয়ে যায় – সঙ্গে সঙ্গে বড়ো ক্ষিদে পায় অসময়ে – (আলফা বিটা গামা – সুভাষ ঘোষ, ক্ষু.স. পৃ.৯৭)

হাংরিরা এই 'গণিকা সভ্যতা'য় আরও দেখেছেন ভ্রূণহত্যা, নেক্রোফিলিক মানসিকতার মতো ভয়ঙ্কর সব অসুস্থতা, বিকার –

১। মনে পড়ে – ১ম ভ্রূণহত্যার পর ভয়ে কয়েক রাত ঘুমুতে পারিনি
২য় বারও সেই ভয় কাটানো যায়নি (ক্ষু.স. পৃ.৩২২)

২। হাসপাতালের মৃত্যুর গন্ধ
সাহসী বানিয়ে ফেলে আমাকে
রিএলি
আমি আরো ১ বার দুঃসাহসী হই
ঢুকে যাই তৎপর
এম্বুলেন্সের ভেতর
তারপর রেপ করি
রেপ করি (ক্ষু.স. পৃ.৬৭)

তাই ষাটের দশকের পটে দাঁড়িয়ে থাকা হাংরিদের লেখায় অনিবার্যভাবে থেকে যায় নৈরাজ্যের লালন –

১। আমার গলিত শব পড়ে থাকে গোলাপকাঁটার ভিতর
শবের আশেপাশে ঘাস আর নৈরাজ্য, উড়ে বেড়ায়
মৌলিক প্রজাপতি; যার ডানা নীল, লাল শুঁড়
বুক ভরা বিষ আর বিষ আর বিষ (ক্ষু.স. পৃ.৫৫৯)

২। আমার সামনে থাকে অত্যাশ্চর্য কুয়াশা, থাকে দড়ি, আর
কালো পৃথিবী (ক্ষু.স. পৃ.৫৬০)

৩। এই অকপট শ্মশান আমাদের উপযুক্তি ভূমি (ক্ষু.স. পৃ. ৫৬১)

৪। আমার আত্মার মধ্যে বিষকবিতার অভ্যুত্থান অহরহ
মানুষের উজ্জ্বল পায়েচলা পথ ছেড়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি দূরে (ক্ষু.স. পৃ.৪৭)

৫। আমি প্রহরীর চোখে চোখ রেখে নিজের থুতু গিলে ফিরে আসি
উদ্বাহু বন্ধনের রজ্জুতে মোম ঘষে নেবার মতো জরুরি

কাজ পড়ে আছে, স্বাধীনতাই ভক্ষণযোগ্য মনে হয় ! (ক্ষু.স. পৃ.৫৫৭)

হাংরিরা দেখেন 'পানীয় জলের প্রস্রাবে রূপান্তর', 'গোলাপের গায়ে বোগলের গন্ধ', 'নখের ভিতর লুকোনো ময়লা'।[১৯] শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, "হাংরিদের ইস্তাহার যতটা লক্ষ করেছি আর তাদের কবিতা বা গদ্যের সঙ্গেও যতটুকু পরিচয় হয়েছে, তাতে মনে হয় যে তাদের চেতনায় নৈরাজ্যবাদের একটা লালন অবশ্যই আছে।"[২০] নৈরাজ্যের রাজ্যে দাঁড়িয়ে হাংরিদের কাছে উত্তরণ কিংবা অধঃপতন কোনোটিরই কোনো অর্থ থাকে না আর –

আমি কোনো উত্তরণ বুঝি না আর
কোনো অধঃপতন বুঝি না,
আজ সন্ধে থেকে মদ খেয়েও কোনো নেশা হয়নি –
আমার যৌনতা আমি খোলা আকাশের নীচে ছড়িয়ে দেবো,
আমি জন্মের ভেতর ঢুকিয়ে দেবো হাত !
আমার ঈশ্বর নেমে আসুক বনপর্বত কাঁপিয়ে।

(ঈশ্বর নেমে আসুক – সেলিম মুস্তাফা, ক্ষু.স. পৃ.৫৩৩)

সম্পর্ক, প্রেম ও মৃত্যু

কেবল সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিসরেও হাংরিরা প্রায়ই নৈরাজ্যবাদী। তাঁরা দেখেছেন, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষ যখন কথা দিয়েও কথা রাখে না, প্রতারণা বা প্রত্যাখ্যান করে চলে যায়, প্রতারিত প্রত্যাখ্যাত মানুষটি তখনও প্রার্থনা করে 'সুখি হোক'। কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায় না, জটিল মানবমন তারপরে হত্যার কথাও ভাবে, এই অসুখ সারানোর ক্ষমতা নেই নিসর্গের -

আমার বুকের রক্তে যে নারীর সিঁথি লাল হয়েছিল
সে যখন অন্য পুরুষের জন্য চলে যায়,
সুখি হোক এই প্রার্থনার পর সেই নারীকে হত্যা করার কথা ভাবি আমি
আমার অসুখ তুমি সারাতে পারবে না তুমি নিসর্গ (ক্ষু.স. পৃ.৫৫৪)

আবার পুরুষের বিশ্বাস ভঙ্গের স্বীকারোক্তিও হাংরি কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে, প্রেমিকাকে আদর করে দেওয়া নাম মনে না থাকলেও মনে থাকে 'প্রতিটি খানকির নাম' –

তোমাকে যেভাবে চুমো খেয়েছিলাম আর
কোনো মেয়েকে সেভাবে খাইনি
আমি ভালোবাসবার চেষ্টা করেছিলাম

বহু বছর পর, আদর করে তোমার নাম
দিয়েছিলাম – নাঃ ভুলে গেছি
অথচ প্রতিটি খানকির নাম মনে আছে –
এই কি জীবনের প্রতি যথেষ্ট ভালোবাসা নয়?
একি নয় আমার বিশ্বাসের প্রমাণ ? (ক্ষু.স. পৃ.৫০)

সম্পর্কের অস্বচ্ছতার চিত্রও তুলে ধরেছেন তাঁরা –

আমি আমার গণিকাগমনের কথা বলিনি প্রেমিকাকে
সেও বলেনি কনট্রাসেভটিপস ব্যবহার করেছে আগে (ক্ষু.স. পৃ.৫৫৩)

জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁরা বুঝেছেন 'আসলে ভালোবাসা একটা খিস্তির চেয়ে বেশি নয়' (ক্ষু.স. পৃ.৫০)। প্রেম ভালোবাসা তাঁদের কাছে 'ছেনালিপনা'র নামান্তর হয়ে ওঠে কখনও কখনও; তাঁরা বলেন –

যতসব আবাল অপোগণ্ডের হৈ-চৈ, কোলাহল ও
প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদির ওপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে।
বস্তুতই এইসব ছেনালিপনা আমার একদম বরদাস্ত হয় না
(অস্থির মগজ ও জেট প্লেন সম্পর্কিত – অরণি বসু, ক্ষু.স. পৃ.১১১)

জীবনে কীভাবে কাম ও প্রেম প্রায় সমার্থক শব্দ হয়ে যায়, তা ফুটে উঠেছে তাঁদের লেখায় -

মনে
আছে একদিন তোমার পাশে শুইনি বলে
পরদিন কথা বলোনি – যতক্ষণ
কাম থাকে শরীরে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেম
মাঝে মাঝে প্রেমভালোবাসাও আমার ভালো লাগে না
ঘুমের ওষুধেও আজকাল কিছু হয় না,
কবিতাফবিতার কাছে গেলেও কিছু হয় না,
আমি সহজভাবে মানুষের মধ্যে যেতে চাই
একবার দেখতে চাই তাতেও কিছু হয় কিনা (ক্ষু.স. পৃ.৫১)

তাঁরা জানেন তাঁদের প্রেমের পরিণামহীনতা –

আমাদের প্রেম পরিণামহীন জৈব-হৃদয়
খেলা করে আমাদের যৌন অবিমৃষ্যকারীতায় (ক্ষু.স. পৃ.৪০৫)

তাঁরা দেখেছেন কতো সহজে ভালোবাসা দিতে গিয়ে কতো সহজে বিষাক্ত হয়ে যায় ভালোবাসা। জগদীশ গুপ্তের মতো এঁরা সবাই সুস্থ সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন 'পরস্পর স্বার্থরক্ষার অপর নাম প্রেমপ্রীতিস্নেহভালোবাসা' (ক্ষু.স. পৃ.৪০১)। তাই তাঁদের লেখনীতে প্রায়ই উঠে আসে এই ধরণের জিজ্ঞাসা -

দুজন মানুষের মধ্যে
যে পাহাড় প্রমাণ দূরত্ব রয়েছে
তারই বা কী হবে! (ক্ষু.স. পৃ.৩৪৭)

তথাকথিত 'প্রেমের কবিতা' তাঁরা কখনই লেখেননি, তাঁদের কবিতায় নেই সেই তুলতুলে ভাব। বরাবর প্রথাভাঙার নিদর্শন রয়েছে তাঁদের প্রায় প্রতিটি কবিতায়। অথচ প্রেমের কবিতা তাঁরাও লিখেছেন, তাঁদের মতো করে, নিজেদের উপলব্ধি থেকেই। 'বুড়ি' কবিতায় মলয় রায়চৌধুরী বলেছেন -

এও আমাকে বলে এবার ঘুমোও
আর রাত জাগা স্বাস্থ্যের পক্ষে
খারাপ, এই বুড়ি যে আমার বউ
বিছানায় শুয়ে বলে, কাউকে নয়
কাউকে দিও না খবর, কারুক্কে নয় –
এ-কথা আমারই, কাউকে নয়
কারুক্কে বোলো না মরে গেছি।[২১]

প্রেমের গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবিতার ছত্রে ছত্রে। বিষাদও উপভোগ্য হয়ে ওঠে এখানে। এক পরম ভরসা, আঁকড়ে থাকাকে লালন করে রেখেছে কবিতার 'বুড়ি'। প্রিয়জনকে হারাবার যন্ত্রণাটাকেও ভাগ করে নিতে চান না কারোর সঙ্গে, এতটাই একান্ত ব্যক্তিগত, এতটাই একার সেই দাবি, হ্যাঁ 'এ-কথা আমারই', কেবল আমারই। এ যেমন একদিকে প্রেমের কবিতা, সেই সঙ্গে এটি মৃত্যুচেতনারও কবিতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মলয় রায়চৌধুরীর নিয়মিত পাঠক মাত্রেই জানেন এই 'বুড়ি' কবির স্ত্রী শলিলা রায়চৌধুরী। আজও সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখে যান ছোট ছোট কিছু কথা 'বুড়ি'কে নিয়ে। নিজেদের কথা বলেন তাঁরা, তাই আত্মপ্রক্ষেপও থাকে অনেকটাই; এমনকী তাই তাঁদের লেখায় চরিত্রদের নামও অনেক সময় হয় তাঁদের নিজেদের নামেই।

'বুড়ি' কবিতাটি পাঠে বোঝা যায় যে, এত ভালোবাসা, এত জীবন-প্রাচুর্যের মধ্যেও মৃত্যুচেতনা কতটা ঘিরে রাখে আমাদের অবচেতনকে। তাই মৃত্যুচেতনাও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে বেশ কিছু কবিতায়। যেমন –

হঠাৎ কান্না পায়
না ব্যর্থ প্রেম বা ক্ষুধার জন্য নয়
আমি মরে যাবো মরে যাবো এই চেতনায়
জীবনের গভীর থেকে উঠে আসে ক্রন্দনের স্বর
এতদিন বুঝিনি আজ বুঝি বেশ ভালোভাবে
জীবনকে বেসেছিলুম ভালো
দারিদ্র ও নৈরাশ্যের ভেতর
অসফল যৌন তাড়নার তীরে
সেই আত্মপ্রেমী ভালোবাসা
ছিল শুধু আলো হয়ে
মৃত্যুর উপত্যকার তীরে। (তিনটি কবিতা - ফাল্গুনী রায়, ক্ষু.স. পৃ.৫৫২)

বন্দীত্ব থেকে 'আমি'র মুক্তি

যাবতীয় বন্দীত্ব থেকেই মুক্তি পেতে চেয়েছেন হাংরিরা। বাসুদেব দাশগুপ্ত যখন বলেন, 'মশারির চাল নেমে আসে – আরও নীচে, আরও কাছে – এবার নাকের ডগা ছোঁবে বুঝি'[২২], তখন বোঝা যায় সাংসারিক বদ্ধতা লেখককে কীভাবে ঘিরে ধরেছে। তাঁদের কাছে যৌনতাও এক ধরণের বদ্ধতা নিয়ে আসে –

ঈশ্বরের মতো বিকারহীন ধ্বংসক্ষমতা হাতে চাই
চাই বিশাল স্বেচ্ছাচারের অধিকার –
স্বাধীনতা,
হায়, ক্ষুধা ও কামের চাপে আমার স্বাধীনতাও ফেঁসে যাচ্ছে
উলঙ্গ, একাকী আমি এই ভয়াবহ বন্দীত্বের ভিতরে এসেছি
চুপচাপ ফিরে যাবো –
সমস্ত সৃষ্টির উত্তরাধিকার ব্যর্থ হয়ে যায়।
('স্বাধীন ও যথেচ্ছ রচনাসমূহ' – সুবো আচার্য, ক্ষু.স. পৃ.৪৯)

আর যা'ই হোক, হাংরি কবিরা যৌনতার পূজারী নন কোনোভাবেই। যৌনতার প্রসঙ্গকে তাঁরা টেনে আনেন যৌনতাকে খণ্ডন করার জন্যই –

সে হাত মুঠো করে ধরেছে লিঙ্গ, সেখানেও ফুটে ওঠে ঘাম
যে আঙুল স্পর্শ করতে চায় জরায়ুর শেষ, সেও হয়ে ওঠে অসাড়
('কুমারীর গুহা' – অরুণেশ ঘোষ, ক্ষু.স. পৃ.৫৬৫)

ঘাম ফুটে ওঠা বদ্ধতাকেই নির্দেশ করে, এবং অসাড়তা তো আক্ষরিকভাবেই সাড়াহীনতাকে বোঝায়। সব মিলিয়ে মানবজন্ম তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছে 'রহস্যময়' ও 'অস্বস্তিকর' - "কী রহস্যময় অস্বস্তিকর মানব জন্মদেয়া / হয়েছে আমাকে"[২৩]। শৈলেশ্বর ঘোষ বলেছেন -

আমার কাছে সারা পৃথিবীময় সমস্ত সৃষ্টিকাজ একই সুরে বাঁধা, আত্মার বন্দিত্ব ও তার মুক্তির প্রচেষ্টা, - তার ক্রন্দন, হতাশার গর্জন ও অভিশাপ থেকে আনন্দে যাবার, এটাই একমাত্র আধুনিকতা চিরকালের – এছাড়া মানুষের অন্য কোনো ইতিহাস নাই! (ক্ষু.স. পৃ.২২০)

আর সেই বন্দীত্বকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন হাংরিরা -

সমস্ত নীতির মুখে লাথি মেরে
আমার সম্পর্কে তোমায় সজাগ করে দেবো,
অযথা কথার খেলাপ করে আমায় প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলো না
অন্তত নিজের জন্যে আমাকে একটু পবিত্র রক্তপাত করার সুযোগ ও নিবিড়তা দাও।
(অস্থির মগজ ও জেট প্লেন সম্পর্কিত – অরণি বসু, ক্ষু.স. পৃ.১১১)

হাংরিরা আগাগোড়া খুঁজে গিয়েছেন আমাদের ভেতরের 'আমি'কে। তাঁরা জানতেন, 'জামাকাপড়ের অনেক নীচে/ মানুষের চোখের বাইরে/ আমি এক স্বতন্ত্র মানুষ।'[২৪] তাঁরা তাই শরীরের নয়, নিঃসন্দেহেই মন ও মননের কারবারি –

আত্মার ক্ষয় নেই ভয় নেই লয় নেই
আত্মা অবলোকনে নেই রয়েছে মননে
যেমন সেতারের তারে সুর নেই কোনো
সুর আছে সেতারির মনে (ক্ষু.স. পৃ.৫৫২)

'জখম' কবিতায় মলয় রায়চৌধুরী বলেছিলেন, 'অসীম বলতে আমি বুঝছি আমার নিজেরই গায়ের চামড়া।'[২৫] বৈদ্যনাথ মিশ্র 'মলয় রায়চৌধুরীর জখম ও অন্যান্য রক্তক্ষরণ' প্রবন্ধে এপ্রসঙ্গে বলেছেন, "এই লাইনটি পাঠক গভীরভাবে অনুধাবন করলে টের পাবেন আকাশের দিকে হাত তুলে 'অসীমকে' অনুধাবন করা যায় না। চেতনার বসতবাটি কবির অস্তিত্বে। তার শুরু ও শেষ উভয়েই তাঁরই বোধে অর্থাৎ দূরে কোথাও নেই, বরং তা নিকটতম, অনুভাব্য।"[২৬]

সুতরাং, হাংরি সাহিত্যের নানা বিষয়-উপাদান ও উপকরণগুলি নিয়ে উক্ত আলোচনায় এটুকু অন্তত বোঝা গেল যে, হাংরি কবিতা ও অশ্লীল কবিতা সমার্থক নয়। হাংরিরা যৌনতার চর্চা করে কেবল - এমন ধরণের মোটা দাগের একমুখী বিবৃতির মধ্যে আসলে লুকিয়ে থাকে বক্তার নিজেকে খুব রুচিশীল প্রতিপন্ন করার একটি নির্বোধ ও ব্যার্থ প্রচেষ্টা। তবে এটাও ঠিক যে, হাংরিদের লেখালেখিতে যৌনতা এসেছে। খুব অনিবার্যভাবে এসেছে, খুব প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে। যৌনতা তাঁদের লেখায় একটি বিষয় উপকরণ মাত্র, 'থিম' নয়। জীবনকে হাংরিরা দেখতে চেয়েছেন খোলা চোখে; কোনো প্রতিষ্ঠানের ঠুলি পরা চোখে নয়। কোনো রকম ভান বা ভন্ডামিকে সহ্য করতে পারেননি তাঁরা। তাই আগাগোড়া ভণ্ডামিকে পুঁজি করে বেঁচে আছে যে সিস্টেম, সেই সিস্টেম হাংরিদেরকে রাবণ প্রতিপন্ন করে রাবণবধের আয়োজন করেছিল একদা। অথচ হাংরিদের রাবণও হাংরিদের মতোই কোনো ছলের আশ্রয় না নিয়ে উচ্চারণ করতে পেরেছিল সেই সত্যকথন –

> আমাকে চিনতে পাচ্ছো না তুমি
> আমি তো ভিক্ষা নিতে আসিনি। ('সীতা' – শৈলেশ্বর ঘোষ, ক্ষু.স. পৃ.৫৭৯-৫৮০)

২। শ্রুতি

অন্তর্মুখীনতা

> আমরা বিশ্বাস করি কবিতা হয়ে ওঠা ছাড়া কবিতার আর কোন চেষ্টা বা উদ্দেশ্য নেই। কোন বাণী, বিধান বা নীতি-প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নয়। কেননা ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি বা সমাজচিন্তার স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে; কবিতায় এসব 'বিষয়' নিয়ে গম্ভীর বাগ্মীতা বা তরল উচ্ছ্বাস হাস্যকর। ('নতুন কবিতার ভূমিকা', শ্রুতি-৭, পৃ. ১)

বিষয়গত দিক থেকে শ্রুতি কবিতার অভিমুখ ছিল অন্তর্মুখী। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পুষ্কর দাশগুপ্ত 'কবিতা সম্পর্কে' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন, "জৈব আর্তনাদ কিংবা সমাজ-চিন্তার স্থান যেখানেই হোক কবিতায় নয়।"[২৭] বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, এটি বলা হয়েছিল সমকালীন হাংরি কবিতার দিকে ইঙ্গিত করে। শ্রুতি কবিদের মতে কবিতায় কোনো তথাকথিত বক্তব্য থাকে না; থাকে কবির বিচিত্র অনুভব সমন্বিত স্বপ্নময় আত্মিক আবহের প্রকাশ। এই একই কথা তাঁরা 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় বারবার করে বলে

গিয়েছেন। পঞ্চম সংখ্যাতে পত্রিকার শেষে 'শ্রুতি সম্পর্কে'[২৮] শিরোনামে বলা হয়েছিল - কোনো রকম ব্যাখ্যা, বিধান বা তত্ত্ব-প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই; চিৎকার বা বিবৃতি কবিতা নয়; রাজনীতি-প্ররোচিত সামাজিকতা বা ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর জৈব মত্ততার স্থান কবিতায় নেই; ব্যক্তির কল্পনাময় আন্তরিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির প্রকাশে ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রচনাই কবিতা, তাই কবিতা হবে ব্যক্তিগত – মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী; কবিতায় কোন একমুখী বক্তব্য বা একটিমাত্র বিষয় থাকে না, থাকে বহু অনুভবের মিলনে জটিল উপলব্ধির আবহ। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে[২৯] বলা হয়েছে – প্রাচীন কাল থেকে নীতিপ্রচার, ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা, ইতিহাস-বর্ণনা, সমাজবিধান সম্পর্কিত চিন্তা প্রভৃতি যে সব প্রতারণার ভার কবিতাকে প্রায়শই বহন করতে হয়েছে কবিতা আজ তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কবিতার বাইরে কবিতার আর কোন দায়িত্ব নেই। কোনরকম প্রচারের সহযোগিতা করা কবিতার কাজ নয়, কবিতা স্বপ্রধান, স্বতন্ত্র।

আত্মঅন্বেষণ

শ্রুতি কবিতার মূল উপজীব্য আত্মঅন্বেষণ, আত্মোন্মোচন। শ্রুতির সপ্তম সংখ্যাতে 'বিষয় ও বিষয়ী' শীর্ষক রচনায় বলা হয়েছিল –

> কিছু কিছু বিষয় আছে, যা ভাবতে ভালো লাগে, হয়তো বাগর্থ-প্রতিপত্তির সম্ভাবনা বিশেষ নেই সেখানে, তবু ভাবতে ভালো লাগে, কবিতার সেই বিষয় মুখ্যতই 'আমি'। সে 'আমি' এখানেও আছে, আবার বিচিত্র বিশ্ব-পরিচয়েও আছে। (শ্রুতি-৭ পৃ.২৮)

পরেশ মণ্ডল তাঁর 'ঘরের নিমগ্ন কোণে' কবিতায় বলেছেন, "বড় বেশি আপনার মনে হয়েছিল/ নিজেকে নিজের"[৩০] কিংবা 'অনুরোধ' কবিতায় বলেছেন, "নিজের দিকে তাকাইনি কখনো/ একবার/ দেখতে চাই/ একটু সময় দাও।"[৩১] সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার অস্থির মুখ' কবিতায় কবিতা জুড়ে কথক নিজের হারানো মুখ খুঁজতে থাকেন –

> কে বলতে পারে বাইরে শিশির
> বাঁধানো উঠোনে নিজের হারানো মুখ পড়ে আছে কিনা।
> কিংবা হয়তোবা জানলাটা খুললেই দেখতে পাবো উপকূলে
> আমি দাঁড়িয়ে আছি আর প্রতিটি ঢেউয়ের চূড়োয় আমার
> নিজের মুখ, আকাশের চেয়েও নিঃশব্দ, জ্যোৎস্নার চেয়েও রূপোলী,
> সমুদ্রের চেয়েও অস্থির আমার মুখ, আমার নিজের হারিয়ে
> যাওয়া মুখ। (শ্রুতি-৫ পৃ.১-২)

পরেশ মণ্ডলের 'বোধি' কবিতায় নিজেকে খুঁজে পাওয়াকেই বোধি বলা হয়েছে, "মৃত্যুর/ সীমানা/ ছুঁয়ে/ সে/ তার/ হারানো/ ছবিটা/ ফিরে/ পেল।"[৩২] তপনলাল ধর 'যেমন' কবিতায় বলছেন, "আমি আমার মুখ দেখি"।[৩৩] গৌরাঙ্গ ভৌমিক 'সারারাত একা একা' কবিতায় বলেছেন, "একা আমার নিশীথরাতের কথোপকথন চলতে থাকে নিজের সঙ্গে।"[৩৪] সজল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'স্বপ্ন উপকূলে' কাব্যগ্রন্থের 'কিছুই বলার ছিলনা' কবিতায় বলেছেন, "কিছু বলব ভাবতে ভাবতে শেষে যা কিছু বলি সব আমারই কথা।"[৩৫] শ্রুতি কবিরা নিজেকে খুঁজতে চেয়েছেন, নিজেকে বুঝতে চেয়েছেন; তাই মাঝে মাঝে নিজেকেও অপরিচিত মনে হয়েছে তাঁদের। মৃণাল বসুচৌধুরীর 'কয়েক মুহূর্ত শুধু' কবিতায় আমরা দেখি কবি বলছেন -

কয়েক মুহূর্ত শুধু মাঝে মাঝে
ক্লান্তিময় নিজেকে
ভী-ষ-ণ
অভিনব আগন্তুক অপরিচিতের মতো মনে হয়। (শ্রুতি-২ পৃ.১১)

আবার 'ছায়া' কবিতায় কবি বিষাদঘন একটি প্রশ্ন তুলেছেন, "আমার ছায়াতে আমি কতোটুকু থাকি?"[৩৬] চতুর্দশ সংকলনে পরেশ মণ্ডল 'কবিতা সম্পর্কে' বলছেন, "এক রক্তাক্ত ভালোবাসা থেকেই কবিতার জন্ম। এবং কবিতার অন্য নাম যুদ্ধ। নিজের সঙ্গে নিজের।"[৩৭] সজল বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তম সংখ্যায় 'ব্যক্তিগত' শীর্ষক রচনায় বলেছেন -

> এমন জগতও আছে যেখানে প্রবক্তার বাণী উচ্চারিত হলেও শোনা যায় না। আন্দোলনের কোলাহল থেকে সে জগত অনেক দূরে। ফুল, নারী, সূর্য্য, তারা, দুঃখ সুখ যা কিছু সেখানে যায় তার রূপান্তর ঘটে, তা সম্পূর্ণ আমার হয়ে ওঠে। এ জগত নিতান্তই আমার জগৎ। আর এর সঙ্গে অন্য কোন, অন্য কারো জগতের তুলনাই করা চলে না। কবিতায় এর কথাই বারবার ঘুরে ফিরে আসে। এর রহস্যই কবিতাকে রহস্যময় করে তোলে। বাইরে থেকে যা কিছু পাই, নিয়ে আসি। যখনই আমার করে নিই, দেখি তার সঙ্গে বাইরের বাস্তব রূপের অনেক তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। রহস্য লোকের গোপন পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের সঙ্গে কথা বলি, সেই নম্র-উচ্চারিত কথাগুলি সাজিয়েই কবিতা লিখি। কেউ শুনতে পাচ্ছে না, আমি নিয়তই কথা বলছি। আমার বিরোধ সঙ্গতি, ক্ষোভ উল্লাস, সমস্ত বৈপরীত্য নিয়ে যে আমি, যার সঙ্গে আছে অন্তহীন রহস্য তার কথাই আমি আমার সঙ্গে বলে চলি। অন্যের সঙ্গে যেভাবে কথা বলি সেভাবে নয়। ভদ্রতা, বিনয় যুক্তি, বোঝানোর প্রচেষ্টা সবকিছু বাদ দিয়েই এই আন্তরিক কথা বলা এর জন্যে, চিৎকার করার দরকার হয় না, তথাকথিত উত্তেজনার প্রশ্নই ওঠে না। আমিই তো আমার শ্রোতা। তাই এর চেয়ে আন্তরিক ও বাস্তবিক কথা বলা আর কার সঙ্গেই বা বলতে পারি।
>
> (শ্রুতি-৭ পৃ.১৫)

এঁদের কবিতার বিষয় 'আত্ম'কে নিয়ে। তাই সুকুমার ঘোষের কবিতার নাম হতে পারে 'আত্মবিলাপ', বা পরেশ মণ্ডলের কোনো কবিতার নাম হতে পারে 'আত্মগোপনের ইতিহাস'। সত্য গুহ তাঁর 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল' গ্রন্থে শ্রুতি কবিদের কবিস্বভাব হিসেবে অন্তর্মুখীনতাকেই চিহ্নিত করে বলেছেন – "প্রাকৃতিক যদি বা কিছু থাকে সামাজিক প্রসঙ্গ এঁদের কবিতায় একেবারেই অনুপস্থিত।"[৩৮] সুমিতা চক্রবর্তীও 'কবিতা ২' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন -

> শ্রুতি পত্রিকার কবিদের কবিতা-চর্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় – সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা – যা ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত অবিরাম অস্থির করেছে পশ্চিমবাংলাকে – এই কবিদের আত্মমগ্ন শিল্প-রচনার ধারণা থেকে চ্যুত করতে পারেনি। নিজের মনকে সংহত করে একটি অকম্প্র-গভীর কাব্যলোক সৃজনের প্রয়াসেই ব্যাপৃত থেকেছেন এই কবিরা।[৩৯]

একাকীত্বের নির্জনতা

অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় বিষন্ন একাকীত্বের একটা সুর এঁদের কবিতাগুলিতে প্রকট হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। বেশ কিছু কবিতায় ক্লান্তি, যন্ত্রণা ও অবসাদগ্রস্ত মানুষের নির্জন অন্তরের অনুরণনও পাওয়া যায়। মৃণাল বসুচৌধুরীর 'তবু' কবিতায় বলা হয়েছে -

আনন্দিত বসে আছো
একা
স্থির অবিচল (শ্রুতি-১৩ পৃ.১৫)

এখানে একাকীত্বের মধ্যে কোনো বিষন্নতাবোধ নেই; এই একাকীত্ব আনন্দের, উপভোগের। তাই 'যদি কেউ' কবিতাতেও এসেছে প্রার্থিত নিঃসঙ্গতার কথা; এই কবিতায় দেখি কবি দরজা খোলেন না একাকীত্বকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে -

দরোজা খুলিনা ভয়ে
যদি কেউ চোখে পড়ে
মুখোমুখি দীর্ঘ পথ জুড়ে
নিঃসঙ্গ পুতুল নিয়ে
যদি কেউ
কখনো হঠাৎ... (শ্রুতি-৫ পৃ.১৩)

আবার অনন্ত দাশের 'হঠাৎ দুপুরে' কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে নির্জন দুপুরের নির্জনতাকে -

এখন বিচ্ছিন্ন আমি
বিজন দুপুর, ভালবাসা, উত্তরণে ডাকে না আমায়
ক্রমশঃ নির্জন হতে হতে, ক্রমাগত দূরে যেতে যেতে
চতুর্দিকে গভীর প্রাকার;

বা, সবাই বুকের মধ্যে নির্জন দুপুর নিয়ে আছে।
কারো যেন নূতন আকাঙ্ক্ষা নেই, ভালবাসা নেই,
হঠাৎ দুপুরে কেন ষ্টীমার আর্তধ্বনি ডাকে
আমার অতীত নেই, ভালবাসা নেই
আমি এক নির্জন দুপুর। (শ্রুতি-২ পৃ.১৯)

'ভালবাসা কোনদিন' কবিতার শেষে ভালোবাসার ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে একাকীত্বের বিষন্নতার সুর -

তবু কেন কোনদিন ভালবাসা ব্যর্থ হয়ে যায়
চোয়ালে লালসা ভেঙ্গে পড়ে
আপন নাভির গন্ধে, নির্জন আবর্তে
মৃগ এক অন্ধকারে ঘোরে। (শ্রুতি-২ পৃ.২০)

'ক্রমশ ক্ষয়ের দিকে' কবিতাতেও বলা হয়েছে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কথা -

বিপুল স্রোতের টানে সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে আজ
আমি যেন নিঃস্ব হয়ে গেছি। (শ্রুতি-২ পৃ.২১)

মৃণাল বসু চৌধুরীর 'ঘরময় পদচিহ্ন' কবিতায় কবির গোপনতা, নির্জনতা চুরি হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে -

সমস্ত বাড়ীটা যেন কারা এসে তছনছ করে চলে গেছে,
আমার সম্পন্ন ঘর টেবিলে রজনীগন্ধা দেওয়াল সাজানো ছবি
আলমারী কবিতার বই উত্তর জানলা আর যতো সব
সঙ্গোপন আসবাব যতো গোপনতা সব ভেঙে চুরে
কারা যেন চলে গেছে

ঘ র ম য় প দ চি হ্ন

তবু আমি বুঝতে পারি নি কে আমার গোপনতা
চুরি করে নির্জনতা চুরি করে (শ্রুতি-২ পৃ.৮)

অনন্ত দাশের ‘এখন আকাশ’ কবিতায় ‘একাকী দুপুরে’র প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে আসে। সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সেই ভাঙা বাড়ীটা’ কবিতাতেও নির্জনতার কথা এসেছে –

সেই ভাঙা বাড়ীটা। ডুবো পাহাড়ের মত সমস্ত
সমুদ্রের মধ্যে সে শুধু দেখতে পেয়েছিল সেই অমোঘ
ভাঙা বাড়ীটা। সেই ভাঙা বাড়ীটা। দুঃখিত নির্জনতার
মত সেই ভাঙা বাড়ীটা। (শ্রুতি-৫ পৃ.২)

সমুদ্রের মধ্যে ডুবো পাহাড়ের মতো সেই অমোঘ নির্জনতা; এবং এই নির্জনতার আগে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ‘দুঃখিত’ শব্দটি। অর্থাৎ এই নির্জনতা দুঃখের।

আবার আত্মমগ্নতার জন্যই শ্রুতি কবিদের কাছে অন্ধকারও একান্ত কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। আমরা মৃণাল বসুচৌধুরীর ‘অন্ধকার’ কবিতায় দেখি কবি বলছেন, “দিনের আলোয় আমি বড়ো বেশী নির্বাসিত যেন/ অন্ধকারে ফিরে পাই/ সঙ্গোপন স্মৃতি স্বপ্ন আমার বিষণ্ণ পৃথিবীকে।”[৪০] দিনের আলোয় সমগ্র পৃথিবী যখন দৃশ্যমান, সেখানে কবি নিজেকে নির্বাসিত মনে করছেন। অন্ধকারে এই বিশ্ব-চরাচর যখন আমাদের চোখের আড়ালে চলে যায়, তখনই কেবলমাত্র নিজস্ব জগতে মগ্ন হওয়া যায়।

বিষাদের স্বাদ

উল্টোদিকে পরেশ মণ্ডলের ‘প্রতিবিম্ব’ কবিতাতে একাকিত্বের অবসাদ এবং নির্মল বিষণ্ণতা পাঠক হৃদয়কে আক্রান্ত করে –

একাকী
জলের
মধ্যে
প্রতিবিম্ব
চারদিক
স্তিমিত
লজ্জায়
যেন
ম্লান
বিকেলের
দীর্ঘ

ছায়া
খেলা
করে
রক্তহীন
নিরালম্ব (শ্রুতি-১ পৃ.১২)

স্বপন সেনগুপ্তের 'তোমার পায়ের কাছে' কবিতাটিতেও আছে সেই নির্মল বিষন্নতার ছোঁয়া, যেখানে কবি চরমতম দুঃখকে নেমে আসার কথা বলেছেন। কবি সকল দরজা থেকে পর্দা সরিয়ে বাধাহীন ভাবে সেই চরমতম দুঃখকে বরণ করে তার পায়ের কাছে নতজানু হতে প্রস্তুত -

রাতের মতো গভীর পায়ে
চরমতম দুঃখ এখন
নেমে আসুক,
সকল পর্দা দুয়ার থেকে
সরিয়ে নেব

সারাটা রাত নতজানু
দুঃখ তোমার পায়ের কাছে। (শ্রুতি-৮ পৃ.২১)

গৌরাঙ্গ ভৌমিকের 'সন্ধ্যার পরে রাত্রি' কবিতায় এসেছে কাঁদতে ইচ্ছের কথা; চোখের জলও যেন মুক্তোর মতো পরম কাঙ্ক্ষিত ও মূল্যবান হয়ে ওঠে এই কবিতায় -

আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে
রাত্রি
আমার হাতের ওপর ফোঁটা ফোঁটা
মুক্তোবিন্দুর মতো জল
পান করে আমি কাঁদতে কাঁদতে বেড়ে উঠি
বছরের পর বছর! (শ্রুতি-৯ পৃ.১৮)

অতীতকাতরতা

আবার পরেশ মণ্ডলের 'সমীক্ষা' কবিতায় এক নির্জন অন্তরের যন্ত্রণা ক্রমশ সূচীমুখ হয়ে ওঠে –

বিছানা পেতেই মনে হলো তার

ঘুমের কথাও বিড়ম্বনা
বহুকাল আগে
চিঠি লিখবার
কথা ছিল
আর
... (শ্রুতি-৫ পৃ.৫)

বহুকাল আগে না লিখতে পারা কোনো চিঠির জন্য অনুশোচনার যন্ত্রনা ক্রমশ সূচিমুখ হয়ে উঠেছে কবিতায় পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তিতে। তাঁর 'অথচ' কবিতাটিতেও এক ধরণের অতীতকাতরতা, এবং সেই অতীতকাতরতা-জনিত বিষন্নতা ভারাক্রান্ত করে পাঠকমনকে -

আগের মতো কিছুই থাকে না বদলে যায়
চেনা বন্দর তীর্থক্ষেত্র ঠাকুর্দার ছবি
চিতোরদুর্গ ছেলেবেলা পুতুল
আগের মতো থাকে না
অন্যরকম
কেমন যেন হয়ে যায়
বদলে যায় (শ্রুতি-৮ পৃ.১৪)

অনন্ত দাশের কবিতায় অতীতকাতরতা খুব স্পষ্ট। তাঁর বহু কবিতায় শৈশবে ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। তাঁর 'এখন আকাশ' কবিতায় শৈশব-স্মৃতির কথা এসেছে। 'সময়ান্তরে' কবিতাতেও বলেছেন, "আমার শৈশব যেন দূরের আকাশে / একটা ঘুড়ির মতো যৌবন খেলায়।"[৪১] কবিতার শেষে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে কিশোর বেলায় ফিরে যাওয়ার কথা – "এখন আবার ফিরে যাব সেই ভোরে/ চম্পা-বকুল-ছড়ানো-কিশোর বেলায়"[৪২] আবার 'দর্পণে যৌবন' কবিতায় বলছেন, "নক্ষত্রে রাখি না স্মৃতি, ধূলায় রাখি না পদভার/ তবু যেন কোনদিন বৃষ্টি হয়ে গেলে/ শিশিরে ধোয়ানো মাঠে/ আমার শৈশব জেগে রয়।"[৪৩] মৃণাল বসু চৌধুরীর 'বিদায়' কবিতাতেও রয়েছে এই অতীতকাতরতা; অতীতের সঙ্গে সংলগ্ন থাকতে না পারার করুণতা -

কি করে প্রমাণ করি
প্রতিদিন সমস্ত দৃশ্যের কাছে
স্মৃতিময় করুণ দুচোখে
আমি
বারম্বার

নিয়েছি বিদায় (শ্রুতি-১২ পৃ.২)

রহস্যময় মগ্নতা

একধরণের রহস্যময় মগ্নতা কাজ করে শ্রুতি কবিতাগুলির মধ্যে। কবিতাগুলি আচ্ছন্নতার ভাব নিয়ে আসে পাঠকের মনে; একটা অন্তঃসলিল আবেগ পাঠকসত্তাকে অধিকার করে বসে। 'শ্রুতি'র দ্বিতীয় সংকলনে বলা হয়েছিল, "যথার্থ কবিতায় রহস্য এবং সংগীতের পরিণয় ঘটে। আর তার লক্ষ্য সেই মায়াবী উচ্চারণ যা কোন আদিম মন্ত্রের মতো ধীরে ধীরে গ্রস্ত করে তোলে। আবিষ্ট বা গ্রস্ত করাই কবিতার উদ্দেশ্য, আঘাত করা নয়। কবিতা বিব্রত বা উত্তেজিত করে না, তার নিগূঢ় জটিলতা, কুহক ক্রমশ এক অনিবার্য সম্মোহনে আবিষ্ট করে।"[৪৪] এখানেই শ্রুতি আন্দোলন সমকালীন হাংরি আন্দোলনের থেকে পৃথক হয়ে যায়। হাংরি কবিদের উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের চেতনাকে আঘাত করা। কয়েকটি শ্রুতি কবিতার অংশবিশেষ তুলে ধরা যাক, যেগুলিতে আচ্ছন্নতার ভাব স্পষ্ট -

১। স্রোত আমার পায়ের নীচে
আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায়
স্রোত আমার বুকের মধ্যে
মূর্চ্ছনার একটি নৌকা
ভাসতে ভাসতে স্বপ্নের দিকে এগিয়ে চলে
(সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নে তোমার গান', শ্রুতি-৭ পৃ.৭)

২। শার্সীর কাঁচে
আর্দ্র হাওয়ায়
বৃষ্টির ফোঁটা
দূরের জানালা
ঝাপসা আকাশ
মেঘেরা এবং
ম্রিয়মান স্নায়ু
কুয়াশার মতো
নিবিড়তাময়
কার ছায়াপাত
আর্দ্র হাওয়ায়
শার্সীর কাঁচে (মৃণাল বসুচৌধুরীর 'বৃষ্টি', শ্রুতি-৫ পৃ.১১)

৩। রক্ত এবং অন্ধকার
সমার্থক বলেই কি
নীল পাখিটার মৃত ঠোঁটে
ভয়াবহ
মরুভূমির ছায়া ? (মৃণাল বসুচৌধুরী 'ভয়াবহ', শ্রুতি-৮ পৃ.২)

৪। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে
ডিনামাইটটার
কোন ক্ষতি হয়নি বলেই
বুকের মধ্যে..... ('বিস্ফোরণ' শ্রুতি-৮ পৃ.৪)

৫। না
মন্দির নয়
নয়
গোরস্থান
জনপদ
অরণ্য বা নদী কিছু নয়
সেতুর ওপরে শূন্য
বাতিঘর থেকে
অস্পষ্ট আলোয় শুধু
শ্বেত মরালের ডানা আর
হরিণের নিঝুম বিশ্রাম... (মৃণাল বসুচৌধুরী 'বাতিঘর', শ্রুতি-১৪ পৃ.১১)

৬। এখনো তোমার
দি
কে
চে
য়ে
আমি রাতদিন
সমস্ত যন্ত্রণা আর
অবিরল সমুদ্রের স্বর ভুলে আছি
(মৃণাল বসুচৌধুরী 'যৌবন',শ্রুতি-২ পৃ.১১)

৭। ছবিটা
ছেঁড়া
বিবর্ণ

ছবিটা
চেনা
পুরনো
ছবিটা
একা
নীরব
ছবিটা (পরেশ মণ্ডলের 'ছবিটা', শ্রুতি-১৩ পৃ.৬)

৮। টেলিফোনে চেনা স্বর ভেসে এলে
বুঝতে পারি
পৃথিবীর পরমায়ু কমে আসছে
সূর্যের আলো তাপ ক্ষয়ে গেছে
বাতাস আর তেমন শব্দ করে না
মাটির নিচে কথাগুলো চাপা পড়ছে (পরেশ মণ্ডলের 'সংবাদ', শ্রুতি-৮ পৃ.১৩)

৯। ডানার আড়াল থেকে
পানপাত্র
ভরে দিয়ে যায়
পানপাত্রে
ছায়া
এবং বৃষ্টি থামলে
ভেঙে
খানখান। (সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃষ্টি থামলে', শ্রুতি-৫ পৃ.৮)

কবিতাগুলি স্পষ্টভাবে কোনো বক্তব্যকে ধারণ করে নেই, এমনকী কোনো নির্দিষ্ট বোধেও নিয়ে যায় না পাঠককে; কেবল পঙ্‌ক্তিগুলির মায়াবী উচ্চারণ ধীরে ধীরে গ্রস্ত করে তোলে পাঠকমনকে।

ব্যক্তিগত উপলব্ধি

শ্রুতি কবিরা তাঁদের ব্যক্তিগত উপলব্ধিকেই বারবার তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁদের কবিতায়। সজল বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তম সংখ্যায় 'ব্যক্তিগত' শীর্ষক রচনায় বলেছিলেন, "কবিতায় এই বাস্তবের কথাই বলতে চাই। আমার আমির বাস্তব। কবিতাকে তাই লৌকিক ও অলৌকিক দু জগতেরই ভাষালিপি বলতে আমি রাজী আছি। সে জগত যখন আমার তখন তা আমার

কাছে নিঃসন্দেহে লৌকিক, আর তা যখন বাইরের জগত থেকে স্বতন্ত্র, তখন তা অলৌকিকও। দেহের স্থূল চাহিদা, উত্তেজনা এ সব পেরিয়ে আমার মধ্যে উপলব্ধির যে জগত যা নিতান্তই আমার, তা-ই আমার কবিতার জগত। এর যুক্তি, এর অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা কোন কিছুই বুদ্ধি নির্ভর নয়, সম্পূর্ণই উপলব্ধি নির্ভর। ... বুদ্ধির স্পষ্ট সিঁড়ি দিয়ে এখানে যাওয়া যায় না, উপলব্ধির রহস্যময় পথ দিয়ে এখানে মগ্ন হয়ে এগিয়ে যেতে হয়।"[৪৫] শ্রুতির দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে, "কবিতায় কবির উপজীব্য আত্মঅন্বেষণ। এবং কবিতার একমাত্র বিষয় কল্পনাময় উপলব্ধি। এছাড়া আর কিছুই নয়।"[৪৬] তিনি মনে করেন আঙ্গিক এবং উপলব্ধির অদ্বৈত-সিদ্ধিই সার্থক কবিতার সৃষ্টি করে। পরেশ মণ্ডল বলেছেন, "কবিতা হচ্ছে ভাষার অন্তরালে উপলব্ধির দ্যুতিময় আত্মপ্রকাশ।"[৪৭] শ্রুতির দশম সংখ্যায় 'শ্রুতি সম্পর্কে' বলা হয়েছে, "শ্রুতির কবিরা চেয়েছেন যথার্থ নতুন কবিতা লিখতে, কবিতাকে সামাজিক, অসামাজিক, দার্শনিক বা রাজনৈতিক বাণীপ্রচারের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে। কবিতা তাঁদের কাছে জটিল ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রতিরূপায়ণের শিল্প-মাধ্যম।"[৪৮] কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক শ্রুতি কবিতা থেকে -

১। চলন্ত ট্রামে পা রেখে
মনে হলো
সব ঝুট হ্যায় (পরেশ মণ্ডলের 'কবিতা ১', শ্রুতি-১০ পৃ.১৬)

২। রেলিঙের ভেজা শাড়ি অনেকে তোলে নি
যাওয়া আসা কত বা সময়
মাঠ পেরোলেই বন
বন পেরোলেই মাঠ
এইটুকু পথ
যাওয়া আসা
কি-ই বা এমন (মৃণাল বসুচৌধুরীর 'পথ', শ্রুতি-৯ পৃ.২৭)

৩। ভুল নয়
ডাকবো না বলেই ডাকি নি
রাজার সমাধি থেকে যাদুঘর
পথটুকু
না চেনা-ই ভাল
ভেবে চিন্তে

তাই আর... (মৃণাল বসুচৌধুরীর 'হয়ত', শ্রুতি-১২ পৃ.৩)

৪। তার বুকের ওপর থেকে দুটি শব্দ তুলে নিয়ে
আমার হাতের ওপর লেখা হল
অনুতাপ নয় (সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুতাপ', শ্রুতি-৯ পৃ.১৪)

আবার পুষ্কর দাশগুপ্তের 'প্রস্তাবনা', 'প্রচ্ছন্ন অঞ্জলি খুলে', 'প্রার্থনা', 'প্রত্যাবর্তন', পরেশ মণ্ডলের 'রহস্যময়', 'আশ্চর্য' ইত্যাদি কবিতায় বিশেষ বিশেষ অনুভূতি চিত্রিত হয়েছে। আবার বিচ্ছেদে-বেদনায় দীর্ণ কবি অনন্ত দাশ বিশ্বব্যাপী ভালোবাসার কথা উচ্চারণ করতে পারেননি, তিনি বলেছেন – "আমার হৃদয় তত বড় নয় পৃথিবীর সবাইকে ভালবাসতে পারি।/ আমার আকণ্ঠ শুধু ঘৃণা জমে আছে/ বিচ্ছেদের বেদনার দায়ভাগ নিয়ে/ সংশয়ে বহন করি বন্ধুদের প্রীতি/ তোমাদের ভালোবাসতে গিয়ে/ আমার হৃদয় আজ হারায় সংহতি।"[৪৯] 'শ্রুতি' সপ্তম সংকলনে বলা হয়েছে "কবিতার একমাত্র অবলম্বন কবির/ব্যক্তির মানসিকতা এবং আন্তরিক অভিজ্ঞতা। স্বপ্ন, কল্পনা, অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিরূপায়ণের মধ্য দিয়ে কবিতা ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রচনা করে। কবির সৃষ্টির মধ্যে গড়ে ওঠে একটি ব্যক্তিগত জগৎ। নির্দিষ্ট বাণী বা বক্তব্য কবিতায় থাকে না। কবিতার হয়ে ওঠা শিল্পরূপের মধ্যে যে বলার সংকেত তৈরী হয় তা শুধু একটা গভীর অনুভব, উপলব্ধির ক্ষণিক স্রোত, কখনো বা মানসিকতার বিশেষ আবহ।"[৫০] মৃণাল বসুচৌধুরী চতুর্দশ সংকলনে 'কবিতা প্রসঙ্গে' বলেছেন -

> কবিতা সব সময়েই অভিজ্ঞতা নির্ভর। আর সে অভিজ্ঞতা কবির অন্তরলোকের রহস্যময় অভিজ্ঞতা।
>
> দিনযাপনের গ্লানি নিয়ে মোটা গলায় হা হুতাশ নেই আমাদের কবিতায়।
>
> আর তাই নতুন পোষাকে সেজেগুজে ক্লান্তির এই রহস্যময় চেহারাকে খুঁজে নিতে কষ্ট হতে পারে পাঠকের। হয়ত সে কারণেই অন্ধ সমালোচকদের মতে আমাদের কবিতা জীবনবিমুখ।
>
> (শ্রুতি-১৪ পৃ.১০)

চতুর্দশ সংকলনে রথীন ভৌমিক 'কবিতা নিয়ে' বলেছেন, "অসংলগ্ন অনুভূতির সতর্ক চয়নে তার সার্বিক বিন্যাস। সম্ভাবনার মধ্যে তার ব্যঞ্জনা। কোনো অনুশাসনেই তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। কবিতা ব্যক্তিগত।"[৫১] যেমন ধরা যাক পরেশ মণ্ডলের 'রেডিওগ্রামে' কবিতাটিতে কবি ব্যক্তিগত অনুভূতির একটি আলেখ্য নির্মাণ করেছেন -

রেডিওগ্রামে সেতার বাজছে

ঘরের মধ্যে কৃপণ অন্ধকার
মনের মধ্যে ঘরের চতুষ্কোণ

চতুর বাতাস খেলা করছে চুলের সঙ্গে
সংগোপনে
সেতার বাজছে
রেডিওগ্রামে
সেতার বাজছে (পরেশ মণ্ডলের 'রেডিওগ্রামে', শ্রুতি-৭ পৃ.১৭)

আবার 'স্বয়ম্বর' বা 'ঘটনাগুলো' কবিতাতেও বিশেষ একটি মুহূর্তের অনুভূতিকে কাব্যরূপ দিয়েছেন কবি -

১। মরা গাছটার ছায়াতে
এ কার পদধ্বনি
শূন্যে শূন্যে জপমালা
যেন
স্বয়ম্বর
এখনি বৃষ্টি নামবে বলে কি
স্বর
থেমে গেল
(পরেশ মণ্ডলের 'স্বয়ম্বর', শ্রুতি-২ পৃ.১৬)

২। ঘটনাগুলো
ঘটে যাচ্ছে
চমকে-ওঠা
ভয়!

পায়ের শব্দে
অস্থিরতা
সারা
উঠোনময়। ('ঘটনাগুলো', শ্রুতি-৭ পৃ.১২)

আবার পরেশ মণ্ডলের 'বাসস্টপে কিছুক্ষণ' কবিতায় দেখি বাসস্টপে দু'মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কবি মানস ভ্রমণ সেরে এসেছেন দিল্লী, মাউন্টআবু, দিলওয়ারা মন্দির থেকে -

সমুদ্র বড় নীল
বাসস্টপে দুমিনিট

তারপর
তুফান চেপে দিল্লী, মাউন্টআবু,
দিলওয়ারা মন্দির, সূর্যাস্তদর্শন
আরো দূরে... দূরে... (পরেশ মণ্ডলের 'বাসষ্টপে কিছুক্ষণ' (শ্রুতি-৭ পৃ.১৮)

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিমান' কবিতাতেও উঠে এসেছে বিশেষ সময়ের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা -

একটার পর একটা সিগারেট
মাথায় বালিশ
পায়ে বালিশ
এপাশ ওপাশ
ঘড়ির শব্দ
পুরোনো কথা
বাক্সে ভরা শব্দ
কিন্তু
রাত অনেক রাত
কিন্তু
ভোর
ঘড়ির শব্দ
ভোর
তবুও..... (সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিমান', শ্রুতি-১২ পৃ.৭-৮)

সারারাত ধরে কথক কীভাবে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে, এপাশ ওপাশ করে, পুরোনো কথার স্মৃতিচারণা করে রাত-ভোর করেছে, সেই বিনিদ্র রাতের ছবি তুলে ধরা হয়েছে কবিতাটিতে।

আবার কালিপদ কোঙারের 'গতি' কবিতায় চক্রবৎ মানবজীবনের কথা বলেছেন কবি -

দগ্ধ পৃথিবী
ছায়া
বৃষ্টি,
আবার রোদ
অশ্বের হ্রেষা
জীবন;
আবার ছায়া

অন্ধকার
অন্ধকার
আর কিছু নেই।
আর
কিছুই নেই? (কালিপদ কোঙার 'গতি', শ্রুতি-৮ পৃ.২২)

উদাসীনতা

শ্রুতি কবি গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতায় আমরা দেখি বাউল প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে বারবার, তাই উদাসীনতার একটা সুর তাঁর কবিতা জুড়ে বহমান থাকে -

১। রাজপুরুষেরা প্রকৃত স্বাধীন ভেবে ঢুকে পড়ে
ভেতর মহলে
উদাসীন
সামনের সিঁড়িতে জ্যোৎস্না
পরিষ্কার
জ্যোৎস্নার প্রবাহে নৈশ সঙ্গীত আসর...
(পাগলা গারদের উত্তরে-দক্ষিণে, শ্রুতি-৮ পৃ.২৩)

২। তখন
ঠিক তখনই
নদীর ধারে
বাউলেরা
গল্প করে
দক্ষিণে একতারা রেখে বুড়ী সন্ন্যাসিনীর দল
উত্তরীয়ের ওপর
ফুলের নক্সা আঁকে **উদাসীনভাবে**
দু'একটি পাখি
গেরুয়া রঙের কাপড়ে ঠোঁট মোছে বিকেলবেলায় (বিকেলবেলায়, শ্রুতি-৮ পৃ.২৪)

৩। গোপন পথিক চলে যায়
শব্দগুলি গায়ে মেখে
বাউলেরা
উদাসীন একতারা বাজিয়ে
না কোনো গভীর দুঃখে নয়

না কোনো আনন্দে রোদ মেখে
না কোনো পতাকা উড়িয়ে যাওয়া নয়
উদাসীন
একতারা বাজিয়ে (শব্দগুলি সহর ছাড়িয়ে, শ্রুতি-৮ পৃ.২৬)

চিত্রশিল্পীর কবিতায় রং

আবার চিত্রশিল্পী তপনলাল ধরের কবিতায় নানা রং, নানা জ্যামিতিক আকার ঘুরে ফিরে আসে। যেমন, তাঁর 'বীক্ষণ' কবিতাটিতে বলা হয়েছে -

শুধু একদিন আলো ও অন্ধকারের ভিতর দিয়ে
লাল
নীল হলুদ
সবুজ গোলাপী
সব
নিভন্ত নিয়নের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে
শুধু
লাল
নীল হলুদ
সবুজ গোলাপী
ত্রিকোণ
বৃত্ত
সমকোণ (শ্রুতি-৭ পৃ.২৩)

আবার তাঁর কোনো কবিতার নাম পাই 'নীল কবিতা'। কিংবা, তাঁর 'অনাহত' কবিতায় আমরা দেখি এক 'সবুজ শহর' -

ফেরিঅলা আয়নাগুলিকে গুটিয়ে
ডালপালা ছাড়িয়ে সবুজ শহরের দিকেই
চলে গেল (শ্রুতি-৭ পৃ.২৪)

আবার তাঁর 'পারস্পরিক' কবিতাটিতে দেখি, শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার মধ্য দিয়েই তিনি বদ্ধতাকে ভাঙেন নিজের মতো করে -

খাতা খুলে আমি
খাতার দেয়ালটা ডিঙিয়ে
খাতা মুড়ে দেয়াল সামনে সরিয়ে দিলাম (শ্রুতি-১০ পৃ.৯)

আবার তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে শহর কলকাতা বিষয় হয়ে ওঠে। নিজের শহরের অনুপুঙ্খ ছবি কবি অঙ্কন করেন এভাবে -

১। ৩ নম্বরে চৌরঙ্গী যেতে কতক্ষণ
আগের ষ্টপে চাঁদনী (কলকাতা ৪, শ্রুতি-৯ পৃ.২৫)

২। ছাতের পর ছাত সাজিয়ে অপরূপ কলকাতা গড়ে তোলেন
তোমরা সকলে কলকাতায় আইস (পরিবর্তনমালা ৪, শ্রুতি-১২ পৃ.১৫)

সমসাময়িকতা থেকে অতীতমুখীনতা

সমসাময়িক ঘটনাকে শ্রুতি কবিরা কখনো বিষয় করেননি ঠিকই, কিন্তু সমসাময়িক ঘটনার প্রসঙ্গ যে কখনই তাঁদের কবিতায় উঠে আসেনি, তা বলা যাবে না। পরেশ মণ্ডলের 'ত্রিভুজ' কবিতায় এসেছে মহাকাশ যান লুনা-১৬ এর প্রসঙ্গ, যার উৎক্ষেপণ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ এবং অবতরণ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭০। আবার কখনো তাঁদের কবিতায় এসেছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রসঙ্গ; জীবনানন্দের বিম্বিসার অশোকের শিলালিপির কথা -

জন্মলগ্নে ভাবা যায়
রক্তে কী স্বরের মধ্যে
বিম্বিসার
অশোকের
শিলালিপি
ত্রয়োদশ
শতাব্দীর
মুখ
(পরেশ মণ্ডলের 'কবিতা ৭৭৭', শ্রুতি-১৪ পৃ.২)

শ্রুতি কবিতায় পুরাণ প্রসঙ্গও এসেছে অনেক বার। যেমন –

১। শত্রুনিধন যজ্ঞ করে
মুক্তপুরুষ আখ্যা দেবো ('হাত ঘোরালেই' - মৃণাল বসুচৌধুরী, শ্রুতি-১২, পৃ.১)

২। আদি পিতা আপেলের রস পান করে

লজ্জিত হয় ('সন্ধ্যার পরে রাত্রি' - গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শ্রুতি-৯, পৃ.১৮)

৩। কবে যেন ত্রাণকর্তা নৌকো দিয়েছিলো
('আত্মবিলাপ ২' - সুকুমার ঘোষ, শ্রুতি-১০, পৃ.১৪)

৪। কেন নগ্নতা ফেলে যুবতী শাড়ীর খোলসে দোলে
সতীপনা প্রিয় পরম্পরা ছলনায় ছলে
যেন অর্জ্জুন আসিয়া টানিলেই
আতুড়ে যাবেন দ্রৌপদী হেসে অবশেষে
পতিহীনা সতী কেন কাঁদে ('পরিবর্তনমালা ১২' - তপনলাল ধর, শ্রুতি-১৪, পৃ.৯)

৫। শীতের মরশুমে ক্রিষ্টিনকীলারের মত যে সমস্ত চন্দ্রমল্লিকা ফুটবে তাদের শব্দ আর
রঙের নন্দনকাননে নিয়ে গেলে উর্বশী, মেনকাদের সঙ্গে তুলনা করা
যাবে কিনা। ('চাঁদ, সূর্য, তারা, চন্দ্রমল্লিকা' - সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রুতি-২, পৃ.১৮)

প্রথম উদাহরণে এসেছে শক্রনিধন যজ্ঞের কথা, দ্বিতীয় উদাহরণে আদি পিতা আদমের প্রসঙ্গ, তৃতীয় উদাহরণে বাইবেলে কথিত পৃথিবী ধ্বংস কালে মানবজাতিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ঈশ্বর প্রদত্ত নৌকার প্রসঙ্গ, চতুর্থ উদাহরণে এসেছে অর্জুন-দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ, পঞ্চম উদাহরণে উর্বশী-মেনকার প্রসঙ্গ এসেছে। আবার সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় এসেছে মনসামঙ্গলের বেহুলা-লখিন্দরের প্রসঙ্গ, কবিতার নাম 'লখিন্দর'।

বদ্ধতা থেকে মুক্তি

শ্রুতি কবিরা কেবল মুক্ত আত্মার কথা বলতে চান বলেই, প্রায়ই তাঁরা আত্মার বদ্ধতা অনুভব করতে পারেন। ফলে সেই বদ্ধতাকে ভাঙার প্রয়াস দেখা যায় তাঁদের কবিতায়। যেমন, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার অস্থির মুখ' কবিতায় বদ্ধতাকে ভাঙার চেষ্টা উচ্চারিত হয়েছে এভাবে –

জানলাটা খোলা যায়নি। আমার লণ্ঠনের চারপাশে আস্তে
আস্তে অন্ধকার। ধারালো দাঁত দিয়ে আঘাত করছিল
লণ্ঠনটাকে।

আর একবার জানলাটা খোলার চেষ্টা করব।
জানলাটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। (শ্রুতি-৫ পৃ.১-২)

আবার মৃণাল বসুচৌধুরীর 'অথচ' কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে সেই বদ্ধতাকে ভাঙতে না পারার কথা -

যতবার আলো নিভে যায়
ঘরের ভেতর বন্দী
ক্লান্ত পক্ষীরাজ
জরাজীর্ণ ডানা ঝেড়ে বাইরে দাঁড়ায়
অথচ হাওয়ার ডাকে
চৌকাঠ পেরোতে গেলে
চতুর্দিক ঢাকে ব্যর্থতায় (শ্রুতি-১২ পৃ.৩)

মৃণাল বসুচৌধুরীর 'বাতায়ন' কবিতায় বলা হয়েছে এক বাতায়নের কথা, যে বাতায়ন কথক কখনো খুলতেই পারেননি -

মাঝে মাঝে আকস্মিক নিতান্ত খেয়ালে বাতায়ন খুলে যায়
রোদ আসে বৃষ্টি ঝড়ে আন্দোলিত হয় ঘরখানি
তবু কোনদিন
বন্ধ বাতায়ন । আমি
নিজ হাতে খুলতে পারিনি – কোনদিন – আপন ইচ্ছায় – (শ্রুতি-২ পৃ.১০)

তাই সমস্ত বদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে নতুন কোনো পথের খোঁজ করেছেন শ্রুতি কবিরা। শ্রুতি কবিতায় তাই ঘুরে ফিরে আসে বারবার কোনো পথের সন্ধানের কথা। সুকুমার ঘোষ 'নয়নতারা থেকে' কবিতায় বারবার বলেছেন – "সুঁদরী কাঠ, সুঁদরী কাঠ, আমায় পথ বলে দিবি?"[৫২] মৃণাল বসুচৌধুরীর 'সেই শূন্যতার মুখোমুখি' কবিতাতেও বলা হয়েছে নতুন পথ সন্ধানের কথা -

ক্লান্ত চোখ দুটো তখন নতুন কোন পথের সন্ধানে। কিন্তু প্রান্তরের মধ্যে কোন পথ ছিল না বোধহয়। কিছুদূর আমি এগিয়েছিলাম একা একা। নিজেকে এক দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মতো মনে হয়েছিল। (শ্রুতি-২ পৃ.৯)

একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় শ্রুতি কবিরা যতটাই এগিয়েছেন তা 'এক দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মতো'।

৩। শাস্ত্রবিরোধী

গল্পহীন গল্প

> না আর গল্প নয় গল্প বলতে পারব না
> আমি কথা বলতে পারি কথা বলব (এ.দ.-৬ পৃ.৩)

ষষ্ঠ সংকলনে প্রকাশিত 'কথা' গল্পের প্রথম বাক্যে রমানাথ রায় একথা বলেছেন। এটিই তাঁর অন্যান্য গল্পেরও মূলকথা। কেবল তাঁর নয়, সমস্ত শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদেরই একই বক্তব্য। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা আদ্যন্ত গল্প বলার শৈলী পরিহার করে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। গত শতকের তিন-চারের দশকে ছিল বিষয়ের বৈচিত্র; আর শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা নির্দিষ্ট বিষয়কেই অস্বীকার করলেন। যেমন ধরা যাক, রমানাথ রায়ের 'গিলিগিলি' গল্পটি। গল্পটির বিষয় কী, সেটা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কাহিনি-লোভী পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারে না রমানাথ রায়ের 'গিলিগিলি', 'বলার আছে', গোগা', 'কোকো', 'লোলা বিয়ার খায়', 'জাল কলকাতা' ইত্যাদি গল্প। শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলি প্রচলিত বাংলা গল্পের বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করে মনন, অনুভূতি ও বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনাকে প্রতিফলিত করতে থাকে। সুতরাং, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও গল্পগুলি অন্য এক জগতের বার্তা নিয়ে আসে; সেই জগৎ বহির্জগৎ নয়, মানুষের অন্তর্জগৎ। রমানাথ রায় বলেছেন —

> শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা গদ্য কেবলমাত্র বাস্তববাদী সাহিত্যের ধারাতেই রচিত হতে থাকে। কে কত বাস্তব গল্প লিখতে পারেন তারই প্রতিযোগিতা যেন শুরু হয়ে যায়। ভয়াবহ দারিদ্র্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, যৌনবিকৃতি গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে। চরিত্রকে জীবন্ত করার তাগিদে চরিত্রদের মুখে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের প্রাবল্য দেখা দেয়। বহির্জগতের ঘটনাই গল্পে গুরুত্ব পেতে থাকে। অন্তর্জগতের কথা বহির্জগতের চাপে হারিয়ে যায়। ... তাঁরা ভুলে গেলেন মানুষের প্রকৃত পরিচয় বহির্জগতে নেই, আছে অন্তর্জগতে। আছে তার মনে।[৫৩]

তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি যখন এত মিশ্র, জটিল ও অনির্দিষ্ট, তখন গল্পে কীভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়, নির্দিষ্ট সমস্যা থাকতে পারে। তাই কখনো কেবলমাত্র ইমেজকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু চিত্রের সমষ্টি হয়ে উঠেছে তাঁদের গল্প। আবার কখনো, কোনো এক মুহূর্তের বিশেষ কোনো ভাবনার অংশ-বিশেষই গল্পকার পাঠকের কাছে পরিবেশন করেছেন। যেহেতু শাস্ত্রবিরোধীরা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়েই বিশ্বাসী ছিলেন না, তাই তাঁদের গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের। ফলত, হাংরি বা শ্রুতি কবিতার মতো এই গল্পগুলিকে বিষয়গত দিক থেকে শ্রেণিবিন্যস্ত করা সম্ভবপর হল না। বরং, শাস্ত্রবিরোধী

লেখকদের কয়েকটি করে গল্প ধরে এই আন্দোলনের বিষয়গত অভিমুখটিকে বোঝার চেষ্টা করা হল।

সুব্রত সেনগুপ্তের শাস্ত্রবিরোধী গল্প

সুব্রত সেনগুপ্তের গল্পগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় যে, এই গল্পগুলির বিষয় প্রথাবদ্ধ গল্পের বিষয়ের থেকে কতটা দূরবর্তী। তাঁর 'চারিদিকে', 'জামা' বা '২০০০ অপমান' ইত্যাদি গল্পে বাইরের ঘটনা খুব সামান্যই। তবে সামান্য এই ঘটনাই বড় মাপের একটি সংঘাত তৈরি করে অন্তর্জগতে। 'জামা' গল্পে আমরা দেখি, একটি নতুন হাল ফ্যাশনের জামা গায়ে দিয়ে গল্পের 'আমি' অনুভব করেছে তার ব্যক্তিত্বটাই বদলে গিয়েছে, অনেক স্মার্ট হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সে যখন বৃদ্ধা মায়ের মলিন পোশাক দেখে, তখন তাঁর মধ্যে শুরু হয় বিবেকের দংশন। আর সেই জামা তাঁর অপরাধবোধের দ্যোতক হয়ে ওঠে। জামা দিয়ে বুক, বুকের শব্দ, পিঠের ঘাম সব ঢাকা থাকে। মৌলিক অস্তিত্বকে চাপা দিয়ে জামা যেন আত্মার এক জেলখানা তৈরি করে। জামা যেন একটা কৃত্রিম জীবনাচরণ। এই ঝকঝকে খোলসে ঢুকে পড়তে হয় আর ক্রমে তাতেই বন্দি থেকে যেতে হয়। জামা খোলার জন্য বোতাম খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বনির্বাচিত খাঁচার মধ্যে মানুষটির দম বন্ধ হয়ে আসে। লেখকের প্রতিবাদ বাইরে থেকে সাহিত্যের একটি প্রচলিত রূপ সম্পর্কে মনে হলেও, গভীরতর অর্থে তা প্রচলিত সমাজ সংস্কৃতি ও মেকি মূল্যবোধ সম্পর্কে।

'বিস্কুট' গল্পে দেখি সুব্রত আর আরতি একটি গোপন অভিসারে প্রয়াসী; সুব্রত তার বৌদি ও ভাইপোকে সিনেমায় পাঠিয়েছে, দাদা ট্যুইশনি করে দশটার আগে ফেরে না। এই রকম সময়ে আরতি সুব্রতর বাড়িতে এসেছে, সঙ্গে এনেছে বিস্কুটের প্যাকেট। কিছুক্ষণ পরে দরজায় শব্দ হলে, আরতিকে আলমারির পিছনে লুকিয়ে রেখে সুব্রত দরজা খোলে, এবং দেখে আরতি এসেছে হাতে বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে। না, এটি কোনো ভূতের গল্প নয় আদৌ। গোপন প্রেমের অপরাধবোধ আর ভয় থেকেই যেন পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে একই দৃশ্যের।

'চুম্বনরহস্য' গল্পটিকে বলা যেতে পারে 'গৃহদাহে'র একটি পুনর্নির্মাণ (Re-creation)। এই গল্পে কথক ছাড়াও আছে মহিম, অচলা ও সুরেশ। কথক হলেন মহিম ও অচলার বন্ধু। মহিমের প্রেমিকা অচলাকে তার সহকর্মী সুরেশ এক দুর্বল মুহূর্তে চুম্বন করে ফেলেছে, যা

অচলা আবার মহিমকে জানিয়েছে। এবং মহিম এতে অচলাকেই দোষী সাব্যস্ত করে তার ওপর রাগ করে বসে আছে। শেষপর্যন্ত আমরা দেখি, কথকের সামনেই সুরেশবাবু অচলার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন নিজের দুর্বলতার জন্য।

আবার 'ঘটনাপুঞ্জ' গল্পে দেখি, বিন্দু নামক এক মেয়েকে অন্য এক ছেলের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গাছের আড়ালে বসে থাকতে দেখে কথকের মনে খুনের ইচ্ছা জেগে ওঠে, কথক ভাবেন "পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর গলায় ফাঁস পরিয়ে দেব"[৫৪]। গল্পের শেষে আমরা দেখি, কথকও দেখেন, বিন্দুর শরীরটা গাছের আড়ালে পড়ে আছে, এবং 'সরু গলায় একটা রঙিন রুমালে ফাঁস পরানো'[৫৫]। খুনটা কি কথকই করেছেন? নাকি এসব কথকের ভাবনা? নাকি কথকের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করেছে বিন্দুর সঙ্গে বসে থাকা ছেলেটি? সন্দেহের নিরসন হয় না।

'গোপালের ইচ্ছে' গল্পটি গোপালের সংগোপন ইচ্ছে দিয়ে শুরু, গোপাল ভাবে এখন সব কিছু তার নিজের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে; ইচ্ছা করলেই গোপাল সুধাকে দেখা দিতে পারে, ইচ্ছে করলে আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করাতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা যায় গোপাল চাইলেও কোনো কিছু নিজের আয়ত্তাধীন রাখতে পারেনি। গোপালের বন্ধু শুভঙ্কর হঠাৎ উদয় হয়ে চায়ের দোকানে কেবিনে ঢুকে সুধার সঙ্গে অশোভন ঘনিষ্ঠতা দেখালে এবং সুধা বিরক্ত হলেও গোপাল কিছু বলে উঠতে পারে না, অথচ গোপালের প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। গোপালের ইচ্ছা হয়ে গেল শুভঙ্করের ইচ্ছের গল্প।

আবার সাধারণ গল্প পাঠের অভ্যাস থেকে 'সুব্রত সেনগুপ্ত ৯' গল্পটিকে প্রাথমিক ভাবে উদ্ভট বলে মনে হয়। গল্পের শুরুটি এরকম -

> গড়ের মাঠ ঘুরতে লাগল। ওপারে আকাশের নীচে গাছের সারি ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে। মাঠের ওপর খুব নরম ঘাস পাতা। একটানা একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দ। মানে এই রকম শব্দ। তার সঙ্গে সঙ্গে শার্সিগুলি কাঁপছে। চোখের খুব কাছেই দু'টো মাথা। মাথা দু'টো অল্প অল্প দুলছে। মাথায় কালো রঙের চুল। ঘন কালো রঙ। তার নীচে ঘাড় গলা তারপর কাঁধ। একটা ঘাড় গলা আর কাঁধ আবার লম্বা চুলে ঢাকা পড়ে গেছে। বাঁদিকে আরও অনেক-গুলো মুখ, বুক, পা। ডানদিকে জানালা। জানালার শার্সি থর থর করে কাঁপছে। জানালার ওপাশে এখন মাঠ শেষ হয়ে খুব চওড়া কালো রাস্তা। ডবল ডেকার বাস দাঁড়িয়ে আছে। তারপর বাসস্টপ-লেখা একটা পোস্ট। একটা চওড়া গাছ। একরাশ পাতার ভারে নুয়ে পড়েছে। একরাশ পাতা নিয়ে গাছটা পেছনের দিকে সরে গেল। রাস্তার ওপারে বাড়ি আরও বাড়ি বাড়িগুলি সরে যাচ্ছে। (এ.দ.-৭ পৃ.১৪)

একটু সচেতন পাঠে বোঝা যায় যে, কথক বসে আছেন একটি বাসের ডানদিকের সারির জানালার পাশের সিটে। এবং তার চোখ দিয়ে কলকাতাকে যেভাবে দেখেছেন, ঠিক সেভাবেই তুলে ধরছেন লেখক। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে কলকাতার ছবি। এই পর্যবেক্ষণ কতটা সূক্ষ্ম হলে বাসের সহযাত্রীর হাতঘড়ির ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ডের কাঁটার রঙও চোখে পড়ে –

> কালো স্কার্টের ওপর সাদা হাত। হাতে ঘড়ি। ঘড়ির তিনটে কাটা, দু'টো কালো আর একটা লাল। (এ.দ.-৭ পৃ.১৬)

গল্পের একটা নির্দিষ্ট বক্তব্য থাকতে হবে, তা কখনই বিশ্বাস করতেন না শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা। তাঁরা শুধু একটি আন্তরজগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। 'ছকভাঙা গল্পকার সুব্রত সেনগুপ্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে গোপা দত্তভৌমিক বলেছেন, "বিষয় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাগুলিকে এই সব গল্পে ডিঙিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানেই শাস্ত্রবিরোধী শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা। সুব্রত সেনগুপ্ত দেখেছিলেন প্রথাগত গল্পে কয়েকটি বাঁধাধরা গৎ থাকে। যেমন, গ্রামীণ জীবনের সারল্য, শহুরে জীবনের যান্ত্রিকতা, কোনও অসাধারণ চরিত্রের উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াকলাপ, আঞ্চলিকতার রং লাগানোর জন্য খুঁটিনাটি তথ্যস্তূপ, সামাজিক কোনও সমস্যার ছবি তুলে ধরা ইত্যাদি। নিজের গল্পে তিনি অত্যন্ত সচেতন ভাবে এই বাঁধা ছককে ভেঙেছেন। তাঁর মতে লেখক সর্বজ্ঞ কোনও অলৌকিক শক্তিধারী নন যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান জেনে আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত কোনও কাহিনি বুনে যাবেন, তিনি শুধু মিশ্র জটিল অনুভূতিলোকের ও অসহায় অস্তিত্বের রূপকার।"[৫৬]

রমানাথ রায়ের শাস্ত্রবিরোধী গল্প

রমানাথ রায়ের 'বলার আছে' গল্পটি বলে ফেলার এক অস্থির আবেগে আপ্লুত। গল্পের 'আমি' কিছু একটা বলতে চায়, কিন্তু সে কিছুতেই তা বলে উঠতে পারে না। 'আমি'র অনবরত বলার চেষ্টা করতে থাকা এবং ক্রমাগত সেই চেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকা নিয়েই এই গল্প —

> আমার কিছু বলার আছে
> বলতে গেলে একটা উঁচু টুলের দরকার
> ভাল গলার দরকার
> ...
> আমার কিছু বলার আছে

জানি আমার টুল নেই
জানি আমার গলা নেই
...
আমার কিছু বলার আছে
আর এই তার উপযুক্ত সময়
এখন রাস্তায় অনেক লোক
...
ফেরার পথে একটা লোক ধাক্কা দিলে
কিছু বললাম না
ফেরার পথে একটা লোক গায়ে পানের পিক ফেলল
কিছু বললাম না
ফেরার পথে একদল মেয়ে আঙুল দেখিয়ে হাসতে হাসতে গেল
কিছু বললাম না
ফেরার পথে কারা যেন মাথায় ময়লা ফেলল
কিছু বললাম না[৫৭]

আত্মপ্রকাশের উপায় খুঁজে না পাওয়ার যন্ত্রণাকে, নিজেকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করতে না পারার বেদনাকে লেখক এই গল্পে তুলে ধরেছেন নিপুণভাবে। অন্তর্বাস্তবতার কথা বলতে বলতে গল্প কখনো কখনো হয়ে উঠেছে আত্ম-অন্বেষণের গল্প, নিজেকে খোঁজার গল্প। 'বলার আছে' গল্পের 'আমি' যখন কিছু বলার অনেক চেষ্টা করেও বলতে পারে না, তখন ঠিক করে — "আমি লিখব লিখেই সব বলব।"[৫৮] অথচ লেখার সময় দেখা গেল —

কাগজগুলো ড্রয়ার থেকে বেরিয়ে পড়ল শূন্যে ভাসতে লাগল
কলম ড্রয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ল শূন্যে ভাসতে লাগল
ওদের ধরতে গিয়ে আমার ডান হাত খসে গেল
ওদের ধরতে গিয়ে আমার বাঁ হাত খসে গেল
উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আমার দুপা খসে গেল
ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে আমার মাথা খসে গেল
সব আলাদা হয়ে গেল
সব শূন্যে উঠে গেল
সব ভাসতে লাগল[৫৯]

এই একই বয়ান পাওয়া যায় সমকালীন হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সুবিমল বসাকের লেখায়— "একেক সময় আমার মনে হয়, আমার য্যান কিচ্ছু নাই — শরীরের চামড়া হাড় গোড় মাথা বুক বেবাক কিছু গতর থিক্যা আলগা হইয়া ইদিক-উদিক ছিতরাইয়া আছে।

আমার ভিতরে তখন আর আমারে পাই না। নিজেরে তন্নি তন্নি কইর‍্যা বিচড়াইতে থাকি।"[৬০] সুব্রত সেনগুপ্তের 'জামা' গল্পেও কথক বলেছেন — "নতুন জামা পরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আধশোওয়া অবস্থায় আমি আমার হাত পা খুঁজতে লাগলাম। খুঁজে পেলাম না।"[৬১]

রমানাথ রায়ের 'গাড়ি' গল্পটিতেও 'বলার আছে' গল্পের মতোই একজনের কথা বলা হয়েছে, যিনি যেতে চান, কিন্তু প্রশ্ন হল 'কি করে কেমন করে?'[৬২] সে ঠিক করে, "আমি যাব, যেভাবে হোক, যেমন করে হোক।"[৬৩]

মাথা উঁচু করলাম
দম বন্ধ করলাম
কোমরে ভর দিলাম
ছোট ঊরু মাটিতে ঠেকিয়ে ঠেললাম
তারপর মাথাটা নামালাম
আবার উঁচু করলাম
দম বন্ধ করলাম
কোমরে ভর দিলাম
ছোট ঊরু মাটিতে ঠেকিয়ে ঠেললাম
কি হল ? আমি কি গেলাম ? যেতে পারলাম ? না, আমার যাওয়া হল না। যেখানে ছিলাম, থাকলাম। (এ.দ.-৭ পৃ.৭)

গাড়িতে পৌঁছানোটাই লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর প্রশ্ন ওঠে -

কিন্তু
এবার
এবার কোথায় যাব
কোনদিকে যাব
কোথায়
কোনদিকে (এ.দ.-৭ পৃ.১৩)

আদৌ কি আমাদের কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য আছে? থাকতে পারে কি? যাওয়া যায়, কিন্তু প্রতিনিয়ত প্রশ্ন ওঠে কোথায় কোন্ দিকে।

তাঁর গল্পগুলিতে না পারার যন্ত্রণা পাঠককে সব সময়ই বেশকিছু প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। এছাড়াও তাঁর 'বিশ্রাম', 'সংকেত', 'কান্না' ইত্যাদি অনেক গল্পই এক বিষন্নতার সুরে ভরপুর। তাঁর 'তক্তপোশ' গল্পটি একটি তক্তপোশকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। একটি

ছোট্ট ঘরের তক্তপোশে শুয়ে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, তারা কোনো একটি সমস্যার মধ্যে রয়েছে। তারা দুজন শুলেই তক্তপোশটি খানিকটা নিচু হয়ে যায়, আর তখনই একটি গোঙানির মতো শব্দ শুনতে পায় তারা, অথচ সেই শব্দের উৎস খুঁজে পায় না তারা। এই তক্তপোশের নিচে ঘুমচ্ছে তাদের খোকা। শব্দের উৎস খুঁজে না পেয়ে তারা শুয়ে পড়লেই আবার তক্তপোশটি নিচু হতে থাকে, আর গোঙানির আওয়াজ বাড়তে থাকে ক্রমাগত।

স্মৃতি, অতীতের কোনো অনুভূতির স্মৃতি কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, অতীতের ফিকে হয়ে যাওয়া কোনো অনুভূতির ঝাপসা স্মৃতি গল্পের বিষয় হতে পারে। রমানাথ রায়ের 'গোগা' গল্পে এই ধরণের স্মৃতি কাজ করে। আপাতভাবে 'গোগা' হল সেই স্থান যা কথক ছেড়ে এসেছেন কিংবা, 'গোগা' অতীতের অন্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, আমরা অতীতে যেতে পারি না, তবে অতীতে ছিলাম। গল্পের শেষদিকে রমানাথ রায় লিখেছেন — "... তবে গোগার কথা বানানো না। গোগা আছে। সত্যি আছে। ম্যাপে না থাকলেও গোগা আছে। ... আমি কোনোদিন গোগায় যাইনি। আমি গোগায় ছিলাম।"[৬৪] 'এই দশকের রমানাথ সেই দশকের রমানাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

> নির্বাসিত রমানাথের ক্লান্ত অবসরে ফিরে দেখা স্মৃতি-বিস্মৃতির তেমনি নিবিড় উপলব্ধি 'গোগা' ... মেদুর স্মৃতি নিয়ে 'গোগা'য় যে ছবি তিনি আঁকেন, তা তাঁর স্মৃতিপটে বোনা ছিল। এ গল্পের প্রতিটি শব্দে, ছোটখাটো বাক্যবন্ধে স্বপ্ন মিশে আছে। অথচ যাকে আমরা ঠিক গল্প বলি তেমন কোনও গল্পই গড়ে ওঠে না। তবু রমানাথের নির্বাসিত জীবন যন্ত্রণার অনুরণন অনুভবী পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়।[৬৫]

আবার রমানাথ রায়ের 'গিলিগিলি' গল্পটির বিষয় কী, সেটা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। সুব্রত সেনগুপ্ত যেমন সাংকেতিক হয়ে ওঠেন 'জামা' গল্পে, রমানাথ রায় আবার সংকেতিকতার নির্দিষ্ট অর্থের বিপরীতে এক অর্থহীনতা তৈরি করেন গিলিগিলি গল্পে। কাহিনি-লোভী পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারে না রমানাথ রায়ের 'গিলিগিলি', 'বলার আছে', গোগা', 'কোকো', 'লোলা বিয়ার খায়', 'জাল কলকাতা' ইত্যাদি গল্পগুলি। 'কোকো' গল্পটির শুরুতে আমরা দেখি কিকি নামক একজন কোকো নামক কাউকে খুঁজছে। তারপরে কোকোকে খুঁজে পেয়ে কিকি তাকে কাছে ডাকে, কিন্তু কোকো কোনোভাবেই কিকির কাছে পৌঁছতে পারে না। আবার 'লোলা বিয়ার খায়' গল্পের শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় যে, পুরুষতান্ত্রিকতাকে এক চাপেটাঘাত করেছেন লেখক এই গল্পে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তো

নারীদের মদ্য পানকে সুনজরে দেখে না। এতে যেন পুরুষের একচেটিয়া অধিকার। এই গল্পে মিস লোলা মঞ্চে গান গাইতে উঠে মাঝখানে গান থামিয়ে বলা শুরু করে,

> "বন্ধুগণ! আজ গান গাইতে আসিনি। এটুকু গাইলাম শুধু একটা কথা বলার জন্যে। আজ এই শেষবারের মতো আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার গান আমার নাচ আমার এই দেহ এতদিন আপনাদের জন্যে ছিল। আজ শেষবারের মতো আপনারা আমার এই দেহ দেখে নিন; দেখে নিন আমার এই গাল, এই ঠোঁট, এই বুক, এই কোমর, এই পাছা। আপনারা এতে রাতের পর রাত আনন্দ পেয়েছেন। কী আছে এতে আপনারাই জানেন। আমি কোনওদিন এর মধ্যে আনন্দ পাইনি।"[৬৬]

শেখর বসুর শাস্ত্রবিরোধী গল্প

শেখর বসুর 'সমতল' গল্পে দেখি সম্পর্কের ভিতরে সম্পর্কহীনতা। পাঁচ জন পাহাড়-ভ্রমণে গিয়ে চারজন পরস্পরের সঙ্গে অতীত পাল্টাপাল্টি করে নেয় — সুখেন্দু–প্রণব, মিহির–অমর। কেবল শিবানীর অতীত বদল করা হয় না। বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘোরার সময় নতুন সুখেন্দু ও শিবানী আলাদা হয়ে যায়। নতুন প্রণব অর্থাৎ আসল সুখেন্দু তাদেরকে খুঁজতে যায়, তাদের ফিরে আসাটা অমর–মিহিরের বয়ানে এরকম —

> হঠাৎ ছপ ছপ শব্দ হল। ... শিবানী একদম শেষে। এই সামান্য পথটুকু আসতে তিনজনের যেন অনেক সময় লাগল। 'এত দেরি কী...।' কথাটা শেষ হল না। তিন জনের মুখই অসম্ভব থমথমে। কাছে দাঁড়িয়ে থেকে দূরে কিংবা পায়ের গোড়ায় দৃষ্টি। শিবানীর আঁচলের একফোঁটা জল পাথুরে মাটিতে মিশে গেল।[৬৭]

পাহাড় থেকে নামার সময় — "শুধু জুতোর শব্দ, লাঠির ঠকঠক্, নুড়ি গড়ানোর আওয়াজ। কারও মুখে কোন কথা নেই। একটা সিগারেট জ্বলল। অন্যবার একটা জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনটে কিংবা দুটো ধরত। এবার শুধু একটা পুড়তে লাগল।"[৬৮] পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে — কেবল সিগারেট নয়, সিগারেটের মালিকও পুড়তে থাকে ভেতরে ভেতরে। শেখর বসু সময় অতিক্রমণ বোঝান একই বা প্রায় একই ঘটনা ও পরিবেশের পুনরাবৃত্তিতে, যেমন – সমতল, অনন্তর ইত্যাদি গল্প। আবার 'অনন্তর' গল্পে রূপকথার মতো কিছু স্থান-কালহীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি ব্যবহার করেছেন। 'রাস্তার দুদিকে' গল্পটিতে দেখি, দুজন উৎসুক তরুণ-তরুণী রাস্তার দুদিক থেকে কাছাকাছি আসার জন্য অপেক্ষা করছে, মাঝে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ির পর গাড়ি। লাল আলো জ্বলে উঠলে, গাড়িগুলি সব

দাঁড়িয়ে পড়ে, এবং সেই তরুণ-তরুণী উল্টো দিকে ছুটে যায় ভিড়ের মধ্যে। এরপর তারা আবিষ্কার করে যে, তারা দুজন আবার রাস্তার দুদিকে, ততক্ষণে সারি সারি গাড়ি আবার ছুটতে শুরু করেছে। অর্থাৎ মিলিত হওয়া সম্ভব নয়।

'হাততালি' গল্পে এমন এক ষাট বছর বয়সী মানুষের কথা বলা হয়েছে, যাকে দেখে 'মনে হয় লোকটা জন্মের পর থেকেই মার খেতে খেতে অদ্ভুতভাবে বেঁচে আছে। নির্যাতনের ছাপ কোনো একটি মুখে এত ভয়ংকরভাবে কখনো ফুটে উঠতে দেখিনি।'[৬৯] সে মেলায় বেলুন ফাটানো খেলা খেলতে গিয়ে বন্দুক ধরতে পারে না ঠিক করে, আশেপাশের লোকজন হাসাহাসি করে। যেখানে চোখ বুজেও যদি গুলি ছোড়া যায় একটা না একটা ফাটবেই, সেখানে একটি বেলুন ফাটিয়ে লোকজনের হাততালিটাকে নিজের প্রাপ্য ভাবে। সে বেলুন ফাটাতে থাকে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো একাগ্রতায় এবং 'সাফল্যের চিহ্ন ওর মুখের কোঁচকানো, তামাটে চামড়া আর গর্তে ঢোকানো দুটো ঝাপসা চোখে যেন মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠল।'[৭০] এছাড়া তাঁর 'বাহাত্তুরে' গল্পটিতে পাই বাহাত্তর বছর বয়সী এক বৃদ্ধের কথা, এবং তাঁর অতিক্রান্ত জীবনটিকে ফিরে দেখা। এক ধরণের মন-খারাপের আবহ তৈরি করে গল্পগুলি। আবার 'দৌড়' গল্পে আমরা দেখি, কথকের এক্কা গাড়ির পেছন পেছন ছুটে আসছে একটি ছেলে। তাকে চকোলেট, খুচরো ও টাকা ছুঁড়ে দেওয়ার পরেও, সে প্রাণপণে ছুটতে থাকে এক্কা গাড়ির পেছনে পেছনে।

আবার 'অথচ' গল্পটিতে দেখি কথক কাউকে খুঁজছেন। তার পায়ের ছাপ চিনতে পারলে কথককে নিয়ে যাওয়া হবে সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির কাছে। কিন্তু ঘরের মেঝে ভর্তি ছোটবড় সেই অজস্র ছাপের মধ্যে থেকে কথক কিছুই বুঝতে পারেন না। শেষপর্যন্ত কথক আবিষ্কার করেন, সেই পায়ের ছাপ তার নিজেরই। তাহলে কথক কি নিজেকেই খুঁজছেন?

কল্যাণ সেনের শাস্ত্রবিরোধী গল্প

কল্যাণ সেনের 'যখন সময়' গল্পে সরোজ নামের একটি ছেলে অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লে মুকুন্দবাবু তাকে তুলে এনে শুশ্রূষা করেন। কিন্তু সরোজ তাকে সহ্য করতে পারে না। মুকুন্দবাবু চলে যেতেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে – "যে কোনও একটা বাসে উঠে বাড়ি ফেরার ঠিক আগে তার চন্দ্রোদয়ের কথা মনে হল। মনে হল, আজ রাতে বৃষ্টি হতে পারে।... সরোজ ভাবল, এখন পৃথিবীর কোথাও কোথাও নিশ্চয়ই বৃষ্টি হচ্ছে ; আর বৃষ্টির

গন্ধ তার নাকে আসতেই সে দেখতে পেল সিঁড়ির বিবর্ণ অন্ধকারে সে পড়ে আছে ; আর ক্রমশ একপাল আরশোলা সন্তর্পণে তার শরীরে উঠে আসছে।"[৭১] 'শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন' শীর্ষক প্রবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন –

> কল্পনাবিহীন অনুদার এবং সাংসারিক হিসেব করা নিতান্তই ছোট মনের মানুষ তাদেরই সঙ্গে কিছুতেই মিলতে পারে না কল্যাণ সেনের গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র।[৭২]

একাকীত্ববোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ অর্থাৎ এলিয়েনেশ শাস্ত্রবিরোধী গল্পসম্ভারে পাওয়া যায়। কল্যাণ সেনের 'বাইরে থেকে' গল্পে বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি তপন বলে একজনকে ক্রমাগত ডাকতে থাকে। মানুষটির ডাক, গেটের শব্দ, আশপাশের লোক জড়ো হওয়া, টুকরো টুকরো কথা, কুকুরের ডাক, দপ দপ করা লাইট পোস্ট – ইত্যাদি বর্ণনা চলতে থাকে। কিন্তু তপন নামের কেউ গেট খোলে না। সব আর্তি, সব ব্যাকুলতা ব্যর্থ হয়। লেখক এই ভাবে সাড়া না পাওয়া মানুষটিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেন। 'শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন' শীর্ষক প্রবন্ধে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন –

> যে পাঠক মানুষের একাকিত্বের কষ্টলাঞ্ছিত অনুভূতিকে ভাষার অবয়বে স্পর্শ করতে চান, তিনি গল্পটিকে সহজে ভুলতে পারবেন না।[৭৩]

'ঘুমের আগে' গল্পে দেখি, গল্পের কথক একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছে, যা তার কোনো পূর্বপুরুষ রচনা করেছিলেন। কথক এতে গর্ববোধ করেন যে, তার পূর্বপুরুষ লেখক ছিলেন। পাণ্ডুলিপিটি পড়া শুরু করে কথক বুঝতে পারেন, এটি একটি 'মনোরম প্রণয়-উপাখ্যান', যার নায়কের নাম নরোত্তম, ও নায়িকা চারুশীলা। এরপরেই তৈরি হয় আসল সমস্যা, সেই নরোত্তম সশরীরে এসে চারুশীলাকে খোঁজা শুরু করে, তার মতে কথক চারুশীলকে লুকিয়ে রেখেছে। শেষ অব্দি পাণ্ডুলিপিটি পড়া হয়ে ওঠে না কথকের।

আবার 'শব্দ' গল্পে সহসা বিস্ফোরিত হয় এক রহস্যময় শব্দ। সেই শব্দের রহস্যটি উন্মোচন করাই যায় না গল্পের শেষ পর্যন্ত।

আশিস ঘোষের শাস্ত্রবিরোধী গল্প

আশিস ঘোষের 'রাস্তা' গল্পের শুরুতে বলা হয়েছে – "একা হাঁটতেই বেশ লাগে। কত শব্দ ভীড় আলো। শাদা দাগ পেরিয়ে বাস লরী ট্যাকসী এড়িয়ে ইচ্ছে মত রাস্তা পার হওয়া যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এপাশে রাস্তা ওপাশে রাস্তা। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে

আলো লাল হলুদ সবুজ। অনেকেই হাঁটছে। সামনে পেছনে।"[৭৪] ভিড়ের মধ্যেও একা হাঁটতে ভালো লাগে কথকের। তাই 'ছটা বেজে তেরো'তে অর্থাৎ কর্মস্থান থেকে ফেরার সময় ভিড়ে বাসে, ট্রামে ওঠা যাবে না, ট্যাকসী পাওয়া যাবে না বলে পরামর্শ দেওয়া হয় 'দশ পয়সার বাদাম' কিনে হাঁটতে হাঁটতে 'এক সময় পৌঁছে যাবেন'। বৃষ্টি নামলে ছাতা না থাকলে গাড়ী বারান্দা বা দোকানের টিনের শেড কিংবা ভিজতে ভিজতে পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে। অবশ্য পৌঁছানোর ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারেননি কথক। গল্পের শেষে বলা হয় -

ভিজতে ভিজতে
ভিজতে
ভিজতে
একসময় হয়তো পৌঁছোন যাবে (এ.দ.-৭ পৃ.৫)

একটা 'হয়তো' থেকে যাচ্ছে, অর্থাৎ পৌঁছানোটা বড় কথা নয়, যাত্রাটাই গুরুত্ব পেয়েছে কথকের কাছে; 'দশ পয়সার বাদাম' খেতে খেতে চলতে থাকা। 'আশিস ঘোষের শাস্ত্রবিরোধী গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে অলোক রায় বলেছেন –

> আশিস ঘোষ 'রাস্তা' ভালোবাসেন, ঠিক রাস্তার জন্য নয়। ঘর থেকে বার হওয়ার জন্য অথবা কোথাও পৌঁছানোর জন্য। শুধু হাঁটার মধ্যেও আনন্দ আছে – পথের বিচিত্র দৃশ্য, খুব রৌদ্রে কিংবা বৃষ্টি ভিজে।[৭৫]

সাধারণ মানুষের তাড়া থাকে কর্মস্থান থেকে ঘরে ফেরার, কিন্তু এই গল্পে কথকের কোনো তাড়া নেই। বাদাম খাওয়ার ব্যাপারটা সেই তাড়া না থাকাকেই দ্যোতিত করে। শুধু যাত্রা, আর যাত্রা।

আশিষ ঘোষের 'সাইকেল' গল্পে এমন এক জনের কথা বলা হয়েছে — তিনি মোটর সাইকেল চালান। চালাতে ভালোবাসেন। যেখানে যত রেস্ হয়, তাঁকে ঠিক দেখা যায়। কিন্তু ফার্স্ট হওয়া তো দূরের কথা, কেউ তাঁকে কোন দিন কোন পুরস্কার পেতেও দেখেনি। তবুও তিনি চেষ্টা ছাড়েননি। বারবার ব্যর্থ হয়েও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার গল্প এটি। শেখর বসুর 'হাততালি' গল্পেও এমন এক ষাট বছর বয়সী মানুষের কথা বলা হয়েছে, যিনি মেলায় বন্দুক দিয়ে বেলুন ফাটান অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো একাগ্রতায় এবং সাফল্যের আনন্দ তার মুখের কোঁচকানো, তামাটে চামড়া আর গর্তে ঢোকানো দুটো ঝাপসা চোখে ফুটে ওঠে।

আবার তাঁর 'সংযোগ' গল্পটিতে দেখি, এক বয়স্ক ব্যক্তি যতটা দ্রুত সম্ভব সাইকেল চালিয়ে কোথাও যাচ্ছে। জরুরি কোনো কাজ রয়েছে তাঁর, সন্ধ্যের মধ্যে সেখানে পৌঁছতে

হবে। অথচ দুপুরে বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ায় দেরি হয়ে গিয়েছে। বয়স্ক লোকটি যে আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সাইকেল চালাতে থাকেন, সেই প্রাণপণ প্রচেষ্টারই গল্প এটি –

> তিনি সাইকেল চালাচ্ছেন। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব চালাতে চেষ্টা করছেন। গায়ের জামাটা ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। পিঠটা ব্যথায় টনটন করছে। চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে আসছে। দু'পাশ দিয়ে গাড়িগুলো যেন গায়ের উপর পড়তে পড়তে আবার পিছলে সরে যাচ্ছে। গরম হাওয়া লাগছে মুখে। চোখ জ্বালা করছে। একটু যেন জল তেষ্টা পেয়েছে।[৭৬]

আবার 'চাকু' গল্পে দেখি কথক একটি চাকু হাতে নিয়ে ঘোরেন, কারণ তার মনে হয় 'এটা কাছে থাকলে, বেশ সাহস পাওয়া যায়।'[৭৭] এবং অনেকগুলি বিষয়ে তার হেস্তনেস্ত করার আছে –

> রাস্তার ভীড় কমাতে হবে
> ফুটপাথ ফাঁকা করতে হবে
> ট্রামে বাসে বসার জায়গা দিতে হবে
> বেকারদের চাকরী দিতে হবে
> মাইনে বাড়াতে হবে
> লোডশেডিং বন্ধ করতে হবে
> অবিলম্বে পাতা রেল চালাতে হবে
> দুর্নীতি দূর করতে হবে
> অনেক কিছুই করতে হবে (এ.দ.-১৯ পৃ.২৮)

তার হাতে চাকু দেখে দু'পাশের লোকজন ছিটকে সরে যাচ্ছে। দূর থেকে কেমন ভয়ে ভয়ে দেখছে কথককে। কিন্তু একটু পরেই দেখা যায়, কেউ আর ভয় পাচ্ছে না। কথক কেবল ভেবেই যায় যে চাকুটা চালিয়ে দেবে, শেষে পিঠে একটি কাক বিষ্ঠা ত্যাগ করলে, কাকটাকে তাক করে সজোরে ছুঁড়ে মারে চাকুটা এবং চাকুটা বেশ খানিকটা ওপরে উঠে সোজা নিচে নেমে আসে, মাথা বুক পিঠ ছুঁয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত নিজের চাকুতে নিজেই ভয় পেয়ে যায় সে। আশিস ঘোষের গল্পে আমরা এমন পরিস্থিতির শিকার, নিরুপায় মানুষের অসহায়তার ছবি পাই বারবার। তাঁর 'ইচ্ছে করে না' গল্পে জীবন-বিতৃষ্ণ এক শিক্ষককে আমরা দেখি। আবার 'আরশোলা' গল্পে আমরা তিক্ত-বিরক্ত শোভেন মল্লিককে আবিষ্কার করি –

> সেই অন্ধকার শহরের রাস্তায় শোভেন একাকী দাপিয়ে বেড়াবে। সামনে কিছু পড়লেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে। লাথি মেরে তছনছ করে দেবে। গোটা শহরে পেট্রোল ছিটিয়ে জ্বলন্ত একটা দেশলাই কাঠি ফেলে দেবে। যাক!

সব কিছু সাফ হয়ে যাক।
পুড়ে যাক
ভেঙে যাক
শেষ হয়ে যাক
কারণ?
কারণ এটা। কারণ সেটা।
অনেক কিছু
আবার কিছুই না
কারণ সবাইকে শোভেন মল্লিক একবার দেখে নিতে চায়[৭৮]

'আরশোলা', 'কাটলেট' ইত্যাদি গল্পে লেখক কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। 'আশিস ঘোষের শাস্ত্রবিরোধী গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে অলোক রায় বলেছেন, "বিষন্নতায় ভরা অন্ধকারাচ্ছন্ন গল্পের অভাব নেই 'এই দশক' পত্রিকায়। তবে আশিস ঘোষ সর্বদাই তেমন গল্প লেখেননি। সচরাচর আমরা যাকে হাসির গল্প বলি, তেমনটা না হলেও 'আরশোলা' ও 'কাটলেট' গল্পে কৌতুককর পরিস্থিতি সৃষ্টিতে গল্পকারের কৃতিত্ব দেখার মতো।"[৭৯] তবে এই কৌতুকের আড়ালেই 'কাটলেট' গল্পে লেখক সমগ্র সিস্টেমকে, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চূড়ান্ত পরিহাস করেছেন। কাটলেট খাওয়ার মতো সামান্যতম কোনো ঘটনা বিশেষ কোনো পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে, এবং সেই অপরাধের জন্য এসে হাজির হতে পারে পুলিশ-সার্জেন্ট, খবর যেতে পারে মন্ত্রীসভায়, এবং তারপর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা – এসবের মাধ্যমেই লেখক তুলে ধরেছেন রাষ্ট্রব্যবস্থার ভণ্ডামিকে।

অমল চন্দের শাস্ত্রবিরোধী গল্প

অমল চন্দের 'রেস্তরাঁ' গল্পে কথক রেস্তোরাঁতে খেতে এসে তার কাছে 'খুবই দামী' একটি জিনিস হারিয়ে ফেলে এবং সেটা খুঁজতে থাকে। সেই সময়ের মানসিক পরিস্থিতি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন অনুপুঙ্খভাবে। কোনো জিনিসের পার্থিব মূল্য ছাড়াও যে আরও অনেক মূল্যমান থাকতে পারে, তা এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। একটি কথোপকথন তুলে ধরা যাক–

দাম যা-ই হোক, আমার কাছে অনেক।
মানে? যে-জিনিসটার বাজার দর পাঁচ টাকা আপনার কাছে তার দাম পাঁচ হাজার টাকা?
আপনি বাজে বকছেন। (এ.দ.-১৯ পৃ.৯)

আবার 'বারান্দা' গল্পে দেখি, একজন ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় ব্যূহের ভেতরে থেকেও মাঝে মাঝে উন্মুক্তির খোঁজে বারান্দায় যেতে চায় – যাওয়া হয় না, তবু সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তার আজীবন বসবাস।

'অবস্থান' গল্পটিতে দেখি, গল্পের কথক তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে থেকেও বিচ্ছিন্ন, চূড়ান্তভাবে একা। গল্পটিকে এমন এক অবস্থানকে নির্মাণ করেছেন লেখক, যেখানে কথকের কথা তাঁর পরিবারের লোকেরা কেউ শুনতে পান না, আবার তেমনি কথকও তাঁর পরিবারের কারোর কোনো কথাই শুনতে পান না। 'অমল চন্দকে যে ভাবে জেনেছি' শীর্ষক প্রবন্ধে অতীন্দ্রিয় পাঠক বলেছেন –

> তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা প্রত্যেকেই একাকীত্বের শিকার, জাগতিক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে দিশেহারা।[৮০]

শেখর বসু 'সেদিন' গল্পেও দেখি 'বারান্দা' গল্পের সেই ব্যক্তিটির মতোই এক ব্যক্তিকে, যিনি বলছেন - "বইটা – ওইতো পড়ে আছে – আমিতো অনায়াসে চাইতে পারি – কিন্তু"[৮১] পারেন না।

বলরাম বসাকের শাস্ত্রবিরোধী গল্প

বলরাম বসাকের 'নিষেধ' গল্পে স্পষ্ট কোনো কাহিনি না থাকলেও, কাহিনির একটা আভাস আছে। উত্তমপুরুষ কথকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজনিত কিছু অনুভবই এই গল্পের বিষয়। কথক শিশুর মতো সহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছুকে দেখতেন। তাঁর তাকিয়ে থাকার নিরপরাধ দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয়নি কখনো, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সে এক নারীর দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু এবার তাঁর নিষ্পাপ দৃষ্টি সমাজের চোখে অপরাধী প্রতিপন্ন হল এবং নেমে এল আক্রমণ। এই আক্রমণে সে বুঝতে শিখল যে, কোনো কোনো দেখা অপরাধের। যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধ থাকে না, ততক্ষণ তৈরি হয় না কোনো অপরাধবোধ। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় 'এই দশক ও বলরাম বসাকের গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, "বস্তু পৃথিবীর মূর্ত বাস্তব সমস্যা এ গল্পে লেখকের অবলম্বন নয়, বস্তুপৃথিবী লেখকের মনে যে বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে তারই আবেগময় প্রকাশ 'নিষেধ'। তাই এক্সপ্রেশানিস্টদের মত এ গল্পে লেখকের কল্পনার অতিরঞ্জন আছে।"[৮২]

আবার সপ্তম সংকলনের ‘গগলস’ গল্পটিকে আপাতভাবে মনে হয় উদ্ভট কল্পনা। গল্পটি সুররিয়ালিস্টদের মতো লেখকের অবচেতন থেকে উঠে এসেছে। এঁদের লেখাতে চেতন ও অবচেতনের সাঁকো বেয়ে যাওয়া আসা চলতে থাকে। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় ‘এই দশক ও বলরাম বসাকের গল্প’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, “এ গল্পের বর্ণনা কোনও স্বপ্ন জগতের কিংবা ঘুম আর জাগরণের মাঝে দাঁড়িয়ে লেখক বলে চলেছেন অনবরত এবং যা বলেছেন, যেমন ভাবে বলেছেন শেষ পর্যন্ত তা-ই গল্প হয়ে উঠেছে।”[৮৩]

আবার ‘কার্পেট’ গল্পটিতে কাহিনির কোনো সুস্পষ্ট আভাস নেই, গল্প জুড়ে পেতে দেওয়া হয়েছে শব্দের কার্পেট। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় বলরাম বসাকের গল্পের বিষয় প্রসঙ্গে বলেছেন, পুরনো গল্প পাঠের অভ্যেস দিয়ে বলরাম বসাকের গল্প পড়লে পাঠককে অসুবিধায় পড়তে হয়। তাঁর গল্প কোনও বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়নি, গল্পকে তিনি বক্তব্য প্রচারের মাধ্যম করে তোলেননি। তাঁর গল্প রাজনীতি-ধর্ম-দর্শন কিংবা মনোবিজ্ঞান – কারওরই দাসত্ব করেনি। তথাকথিত বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে বলরামের গল্পগুলি অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের যে আদর্শগুলি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, বলরামের গল্প সম্পূর্ণত সে আদর্শেরই অনুপন্থী। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরা মানুষের মৌল সমস্যাগুলি তথা একাকীত্ব – হতাশা- যৌনতা মানসিক অবনমন ইত্যাদিকে গল্পের বিষয় করে তুলে পাঠকের গল্পপাঠকে একঘেয়ে করে তুলেছিলেন। বলরাম বসাক প্রথাগত সাহিত্যের ক্লান্তিকর সেন্টিমেন্টালিজম থেকে বাংলা ছোটগল্পকে মুক্তি দিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে।[৮৪] একথা সমস্ত শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সুনীল জানার শাস্ত্রবিরোধী গল্প

সুনীল জানার ‘স্বপ্নসিরিজ এক দুই তিন’-এ বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাকে সাজিয়ে কোলাজ তৈরি করা হয়েছে। ‘সীমাহীন নিঃসঙ্গতার শিল্পী সুনীল জানা’ শীর্ষক প্রবন্ধে শৈলেন সরকার বলেছেন, “কাহিনিকে তিনি একেবারে সম্পূর্ণতই বর্জন করেছিলেন। এই গোষ্ঠীর অন্য লেখকদের মধ্যে কাহিনির চেয়ে আঙ্গিকে জোর দেওয়ার প্রবণতা থাকলেও তাঁরা কেউই কাহিনিকে পুরোপুরি বিদায় জানাতে পারেননি।”[৮৫] এখানেই তিনি অন্যান্য শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের থেকে আলাদা হয়ে যান।

কল্যাণ সেনের মতো সুনীল জানার গল্পে সীমাহীন নিঃসঙ্গতা টের পাওয়া যায়। যেমন, 'আমি বা লোকটা' গল্পে 'রোজই একটা লোক এসে আমার বাড়িতে আমার খোঁজ করে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে কোনওদিনই তার দেখা হয় না। আমি যখন বাড়িতে থাকি না, ঠিক তখনই আসে লোকটা। রোজই আমি বাড়ি ফিরে লোকটার কথা শুনি।'[৮৬] শেষে একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য কথক সেই লোকটিকে খুঁজতে বের হন, কিন্তু যখন ফিরে আসেন তখন তাঁর মেয়ে তাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, "মা – ওমা, সেই লোকটা এসেছে আবার।"[৮৭] কথক কি আসলে নিজেই নিজের খোঁজ করে চলেছেন? বা, 'রং নাম্বার' গল্পে আমরা দেখি কথক বলছেন যে তার ঘরে কোন ফোন নেই। অথচ সে ঘুমের ঘোরে একটানা ফোন বাজার শব্দ শুনতে পায় – প্রথমে অনেক দূর থেকে, তার পর যেন মাথার কাছে, অবশেষে মাথার মধ্যে ক্রমাগত ফোনটা বেজেই চলে। গল্পটির প্রতিটি বাক্যেই নির্বিকার উচ্চারণ। প্রতিটি বাক্যেই কথক আবিষ্কার করেছে সে একা। যেন এক ক্লান্তি, বিষাদ, অসহায়তা। পাঠককেও সন্ত্রস্ত হতে হয়, সত্যিই কি কেউ আছে তার?

অন্যান্য শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের গল্প

অতীন্দ্রিয় পাঠকের 'ত্রিমাত্রিক' গল্পটি আবর্তিত হয়েছে একটি মৃতদেহকে ঘিরে। গল্পের শুরুতে আমরা দেখি, প্রীতি নামক এক মেয়ের মৃতদেহ পড়ে আছে, পাশে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন গল্পের কথক। কথকের চোখে প্রীতির মৃতদেহ মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যায়। আর তখনই একে একে আরও তিনজনকে উঠে আসতে দেখেন কথক। এই তিনজন হল প্রীতিরই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের এক একটি রূপ, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কালের প্রীতি। প্রথম জন হল কথকের বন্ধুর বোন ফ্রক পরা, দুটো বেণী বাঁধা বারো-তেরো বছর বয়সের প্রীতি; দ্বিতীয় জন হল শাড়ি পরা, একটি বেণী বাঁধা কলেজে পড়া প্রীতি; আর তৃতীয় জন হল অসংলগ্নভাবে শাড়ি পরা কেবল চেয়ে থাকা প্রীতি, যে কথকের স্ত্রী। স্ত্রীর মৃত্যুর অভিঘাতে কথকের অন্তর্জগতের রূপটিকে গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পে।

তপনলাল ধরের 'স্কাইস্ক্র্যাপার' গল্পটিতে দেখি একজন ব্যক্তি এক নারীকে 'একটু ব্যক্তিগত' কিছু কথা বলতে চান। যেহেতু 'দরকারটা একটু ব্যক্তিগত', তাই আশপাশ থেকে সমস্ত লোকজনকে সরে যেতে বলা হয়। তারপর একে একে ঘর থেকে সমস্ত আসবাবপত্রও সরিয়ে দেওয়া হয়। তাতেও সেই ব্যক্তি তার 'একটু ব্যক্তিগত' কথা বলতে আপত্তি প্রকাশ

করলে, একে একে ঘরের দরজা, জানালার কপাট, দেওয়াল সব সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সেই নারীকে নিজের শরীর থেকে সমস্ত পোশাক, প্রসাধনও সরিয়ে দিতে হয়। একে একে সব সরাতে সরাতে এই নারী ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলে তাঁর স্মৃতিও। যে কোনো বিষয়েই বলা শুরু করলে তাঁর এক কথা - 'ভুলে গেছি'। আর যার 'একটু ব্যক্তিগত' দরকার ছিল, তারও শেষ অব্দি কিছুই বলা হয়ে ওঠে না। হয়তো আমাদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু ব্যক্তিগত কথা থাকে, যা একান্তই আমাদেরই।

সমর মিত্রের 'আ' গল্পটিতে দেখি একজন ব্যক্তির কিছু করার ছিল, অথচ সে কিছুই করে উঠতে পারে না। তাঁর 'দুইজন' গল্পে আবার এক চাকুরে দম্পতির জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে কিছু সংলাপ ও তারপরে কিছু শব্দের সংশক্ত প্রয়োগে।

উদয় ভট্টাচার্যের 'কোলাজ' গল্পটিতে রয়েছে চারটি ভিন্ন ভিন্ন সংগৃহীত অংশের কোলাজ। এবং আপাত সম্পর্কহীন সেই চারটি অংশের মধ্যে যোগসূত্রটি নির্মাণ করেছে এই গল্পটি। প্রথম অংশটি 'ইউলিসিস' থেকে, দ্বিতীয় অংশটি রুশ কবি বোরিস পাস্টারনকের কবিতা থেকে, তৃতীয় অংশটি উপনিষদ থেকে, এবং চতুর্থ অংশটি রেলওয়ে স্টেশনের ঘোষণা তালিকা থেকে গৃহীত।

মোহিত চক্রবর্তীর 'শিস' গল্পে দেখি এক সময়ে রাস্তাঘাটে শিস দেওয়া কথকের কাছে শিসের কত বহুবিধ অর্থ ছিল। এখন সেসব আর নেই। তবুও এখনও কেউ শিস মারলে কথক হা করে চেয়ে থাকেন।

রথীন ভৌমিকের 'ছবি' গল্পে দেখি কথক একটি ছবি আঁকতে আঁকতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ছবিটা তাঁর নিজেরই ছবি। ঘুমের মধ্যে সেই ছবির সূত্র ধরে তাঁর জীবনের একটি রূপরেখা অঙ্কন করা হয়েছে। সেই ছবিটা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না আর। আসলে আমরা হয়তো আমাদের সারাটা জীবন ধরে নিজেকেই অঙ্কন করে যাই, এই অঙ্কন চলতে থাকে আমাদের শেষদিন পর্যন্ত, তবুও এই অঙ্কন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

কুমারেশ নিয়োগীর 'তখন সমুদ্রের পাড়ে' গল্পে এক সমুদ্রতটের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। চলচ্চিত্রের মতো করে লেখক কিছু খণ্ডচিত্র নির্মাণ করেছেন কিছু আপাত অসংলগ্ন কথাবার্তা ও ভাবনাচিন্তাকে জুড়ে দিয়ে। তবে গল্পের শেষ সংশয়, শূন্যতায়, একাকীত্বে।

মদনমোহন বিশ্বাসের 'তিল' গল্পে দেখি কথক একটি তিল খুঁজে চলেছেন, কিন্তু তা খুঁজে পাচ্ছেন না, অথচ এই তিল ঘিরে তাঁর মনে একধরণের ভীতি কাজ করছে। সেই অনুভূতিটিকেই লেখক অঙ্কন করেছেন এখানে।

এভাবেই শাস্ত্রবিরোধী গল্পকাররা গল্পের ছোট পরিসরে আমাদের অন্তর্বাস্তবতার কথা নানাভাবে বলে গিয়েছেন। 'পঞ্চাশৎ পরিক্রমা' গ্রন্থে সমরেশ মজুমদার 'ছোটগল্প ২' শীর্ষক প্রবন্ধে শাস্ত্রবিরোধী গল্প-আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেছেন –

> অন্তর্বাস্তবতার একটি ধারা গল্পে যোজিত হল, এগুলি 'single sitting' বড়ো জোড় Poe-এর a prose narrative requiring from half an hour to one or two hours for its perusal.[৮৮]

তথ্যসূত্র

১। সন্দীপ দত্ত, বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক, কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩, পৃ. ৩।

২। শ্রীমন্তী সেনগুপ্ত, 'হাংরি আন্দোলনের কবি মলয় রায়চৌধুরী' প্রবন্ধ, উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কবিতীর্থ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, ৩৮ তম বর্ষ, বর্ষা ১৪২৬, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ১৫০।

৩। উত্তম দাস, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা-৭৪৩৩০২ : মহাদিগন্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৩-৪৪।

৪। তদেব, পৃ. ৪৫।

৫। তদেব, পৃ. ৪৬।

৬। শ্রীমন্তী সেনগুপ্ত, 'হাংরি আন্দোলনের কবি মলয় রায়চৌধুরী', উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত কবিতীর্থ, পৃ. ১৫২।

৭। https://en.wikipedia.org/wiki/Fanny_Hill Dt. 20.10.2020.

৮। ঐ।

৯। ঐ।

১০। সুভাষ কুণ্ডু, 'হাংরি রচনা ধর্ম না অশ্লীলতা?' প্রবন্ধ, শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', কলকাতা-৭৩ : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৪৯।

১১। প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়' প্রবন্ধ, উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত কবিতীর্থ, পৃ. ১২৪।

১২। তদেব, পৃ. ১২৫।

১৩। পৃথা রায়চৌধুরী, 'মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা', উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত কবিতীর্থ, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

১৪। সুভাষ ঘোষ, বইসংগ্রহ ১, কলকাতা-১১ : গাঙচিল, মে ২০১৭, পৃ. ১১৪।

১৫। তদেব, পৃ. ৫৭।

১৬। তদেব, পৃ. ৩৫।

১৭। সুবিমল বসাক, সুবিমল বসাক সংকলন, প্রথম খণ্ড, হাওড়া-৭১১৩১২ : সৃষ্টিসুখ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৩।

১৮। সুভাষ ঘোষ, পূর্বোক্ত বইসংগ্রহ ১, পৃ. ১২২।

১৯। রবিউল, 'যে কোনো সুন্দর জিনিস', শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৫৬৩।

২০। অরুণেশ ঘোষ, 'সাক্ষাৎকার : শঙ্খ ঘোষ', শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৪৮১।

২১। মলয় রায়চৌধুরী, 'বুড়ি', উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত কবিতীর্থ, পৃ. ১৪২।

২২। বাসুদেব দাশগুপ্ত, 'ইলিশ আসছে', শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ১৯৩।

২৩। সুবো আচার্য, 'স্বাধীন ও যথেচ্ছ রচনাসমূহ', শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৪৭।

২৪। প্রদীপ চৌধুরী, 'ব্যক্তিগত/৮৪', শৈলেশ্বর ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন', পৃ. ৫২৩।

২৫। মলয় রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১, বাঁশদ্রোণীঘাট রোড, কলকাতা-৭০ : আবিষ্কার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৫, পৃ. ২০৫।

২৬। বৈদ্যনাথ মিশ্র, 'মলয় রায়চৌধুরীর জখম ও অন্যান্য রক্তক্ষরণ' প্রবন্ধ, উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত কবিতীর্থ, পৃ. ১৩৪।

২৭। শ্রুতি পত্রিকা, প্রথম সংকলন, ৬৮/৪ সি পূর্ণদাস রোড, কলকাতা-২৯, পৃ. ১।

২৮। শ্রুতি পত্রিকা, পঞ্চম সংকলন, ৪২-গড়পার রোড, কলকাতা-০৯, জুলাই ১৯৬৬, পৃ. ১৮।

২৯। শ্রুতি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংকলন, ৬৮/৪ সি পূর্ণদাস রোড, কলকাতা- ২৯, সম্পাদকীয় নিবন্ধ।

৩০। তদেব, ১৬।

৩১। শ্রুতি পত্রিকা, সপ্তম সংকলন, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডল সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, জানুয়ারি ১৯৬৮, পৃ. ১৭।

৩২। শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত পঞ্চম সংকলন, পৃ. ৬।

৩৩। শ্রুতি পত্রিকা, দশম সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, মার্চ ১৯৬৯, পৃ. ১০।

৩৪। শ্রুতি পত্রিকা, অষ্টম সংকলন, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডল সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, এপ্রিল ১৯৬৮, পৃ. ১৪।

৩৫। উত্তম দাশ, পূর্বোক্ত 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৮৪।

৩৬। শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত প্রথম সংকলন, পৃ. ৪।

৩৭। শ্রুতি পত্রিকা, চতুর্দশ সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, আগস্ট ১৯৭১, পৃ. ১।

৩৮। সত্য গুহ, একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল, কলকাতা-১২ : অধুনা, ১৯৭০, পৃ. ৩৪২।

৩৯। পঞ্চাশৎ-পরিক্রমা, শান্তিনিকেতন : গবেষণা-প্রকাশন বিভাগ, বিশ্বভারতী, ২২ শ্রাবণ ১৪০০, পৃ. ২৩।

৪০। শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত প্রথম সংকলন, পৃ. ৩।

৪১। তদেব, পৃ. ৬।

৪২। তদেব, পৃ. ৭।

৪৩। তদেব, পৃ. ৮।

৪৪। শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সংকলন, সম্পাদকীয় নিবন্ধ।

৪৫। শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত সপ্তম সংকলন, পৃ. ১৫-১৬।

৪৬। শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সংকলন, সম্পাদকীয় নিবন্ধ।

৪৭। তদেব, পৃ. ২।

৪৮। শ্রুতি পত্রিকা, দশম সংকলন, মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, ৩৫-এফ, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, মার্চ ১৯৬৯, পৃ. ৩।

৪৯। শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত প্রথম সংকলন, পৃ. ৮।

৫০। শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত সপ্তম সংকলন, পৃ. ২।

৫১। তদেব, পৃ. ১২।

৫২। শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সংকলন, পৃ. ৫।

৫৩। রমানাথ রায়, 'শাস্ত্রবিরোধীতা : ছোটগল্প ও শাস্ত্রবিরোধীতা' প্রবন্ধ, ধনঞ্জয় ঘোষাল, প্রগতি মাইতি ও দেবাশিস মজুমদার (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যে আন্দোলন, কলকাতা-১১৮ : ইসক্রা, জুন ২০১৪, পৃ. ১৪।

৫৪। সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৩৮।

৫৫। তদেব, পৃ. ১৩৯।

৫৬। গোপা দত্তভৌমিক, 'ছকভাঙা গল্পকার সুব্রত সেনগুপ্ত' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ. ৩৭১।

৫৭। শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প', পৃ. ৪১।

৫৮। তদেব, পৃ ৪২।

৫৯। তদেব, পৃ. ৪২-৪৩।

৬০। সুবিমল বসাক, পূর্বোক্ত সুবিমল বসাক সংকলন, পৃ. ১৩।

৬১। শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প', পৃ. ৫৭।

৬২। এই দশক, সপ্তম সংকলন, কলকাতা-৩৮, শ্রাবণ ১৩৭৫, পৃ. ৬।

৬৩। ঐ।

৬৪। শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬।

৬৫। সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'এই দশকের রমানাথ সেই দশকের রমানাথ' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩৬০-৩৬১।

৬৬। সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ. ১০৬।

৬৭। শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৫।

৬৮। তদেব, পৃ. ৬৫-৬৬।

৬৯। এই দশক, উনবিংশ সংকলন, ৫১ ষষ্ঠীতলা রোড, কলকাতা-১১, পৃ. ১০।

৭০। তদেব, পৃ. ১০-১১।

৭১। শেখর বসু সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৬।

৭২। সুমিতা চক্রবর্তী, 'শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার কল্যাণ সেন' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, কলকাতা-৭০০১১১ : গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৪০৫।

৭৩। তদেব, পৃ. ৪০৪।

৭৪। এই দশক, সপ্তম সংকলন, কলকাতা-৩৮, শ্রাবণ ১৩৭৫, পৃ. ১।

৭৫। অলোক রায়, 'আশিস ঘোষের শাত্রবিরোধী গল্প' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৩৮১।

৭৬। সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ.১৪১।

৭৭। এই দশক, উনবিংশ সংকলন, ৫১ ষষ্ঠীতলা রোড, কলকাতা-১১, পৃ. ৩১।

৭৮। সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ.১৬৫।

৭৯। অলোক রায়, 'আশিস ঘোষের শাত্রবিরোধী গল্প' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৩৮৪।

৮০। অতীন্দ্রিয় পাঠক, 'অমল চন্দকে যেভাবে জেনেছি' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃ. ৪১০।

৮১। এই দশক, ষোড়শ সংকলন, কলকাতা-১১, বৈশাখ ১৩৭৯, পৃ. ২৬।

৮২। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'এই দশক এবং বলরাম বসাকের গল্প' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৪২২।

৮৩। তদেব, পৃ. ৪২৩।

৮৪। তদেব, পৃ. ৪২৭।

৮৫। শৈলেন সরকার, 'সীমাহীন নিঃসঙ্গতার শিল্পী সুনীল জানা' প্রবন্ধ, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূর্বোক্ত 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃ. ৪৩৫।

৮৬। এই দশক, উনবিংশ সংকলন, ৫১ ষষ্ঠীতলা রোড, কলকাতা-১১, পৃ. ২১।

৮৭। তদেব, পৃ. ২৭।

৮৮। সমরেশ মজুমদার, 'ছোটগল্প ২' প্রবন্ধ, পঞ্চাশৎ পরিক্রমা, শান্তিনিকেতন : গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, বিশ্বভারতী, ২২ শ্রাবণ ১৪০০, পৃ. ৯৬।